Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

ঈমানের স্বরুপ, শর্ত ও ঈমান ভঙ্গের কারণ

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওলানা মাহবুবুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

উম্মে কুলসুম কলি

রোলঃ 23090120108

২০ নভেম্বর, ২০২৫ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

ঈমানের স্বরুপ, শর্ত ও ঈমান ভঙ্গের কারণ

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওলানা মাহবুবুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

উম্মে কুলসুম কলি

রোলঃ 23090120108

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, “ ঈমানের স্বরুপ, শর্ত ও ঈমান ভঙ্গের কারণ ” বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে উম্মে কুলসুম কলি, আইডিঃ 23090120108 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওলানা মাহবুবুর রহমান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মাও: আরমান হোসাইন
কুরআন ট্রান্সলেশন ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, “ ঈমানের স্বরুপ, শর্ত ও ঈমান ভঙ্গের কারণ ” শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাওলানা মাহবুবুর রহমান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব প্রচেষ্টায় প্রস্তুত করা হয়েছে, যেখানে প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে এবং সেগুলো যথাযথভাবে তথ্যসূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

Umme Kulsum

(স্বাক্ষর)

উম্মে কুলসুম কলি

আইডিঃ 23090120108

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

তারিখঃ

২০ নভেম্বর, ২০২৫ ইং

সূচিপত্র

অধ্যায় এক - ঈমানের প্রাথমিক আলোচনা 5

অধ্যায় দুই - ঈমানের সাতাত্তর শাখা 23

অধ্যায় তিন - কুফর, শিরক ও গুনাহে কবীরা 43

অধ্যায় চার - ইসলামের দৃষ্টিতে গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ও জাতীয়তাবাদ..................................53

অধ্যায় এক - ঈমানের প্রাথমিক আলোচনা

১. ঈমানের অর্থ

‘ঈমান’ (إيمان) শব্দের শাব্দিক অর্থ হলো—
বিশ্বাস করা, সত্য বলে মানা, অন্তরে গ্রহণ করা এবং সে অনুযায়ী কাজ করা।

ইসলামী পরিভাষায় ঈমান বলতে বোঝায়—
আল্লাহ ও তাঁর নির্ধারিত বিষয়গুলোকে অন্তর দিয়ে বিশ্বাস করা, মুখে স্বীকার করা এবং কর্মের মাধ্যমে তা প্রকাশ করা

২. ঈমানের মূল ভিত্তি

ঈমান ছয়টি মৌলিক উপাদানের ওপর প্রতিষ্ঠিত, যাকে ঈমানের ছয়টি রুকন বলা হয়—

1. আল্লাহর প্রতি ঈমান
আল্লাহকে একমাত্র রব, ইলাহ, স্রষ্টা ও পরিচালনাকারী হিসেবে বিশ্বাস করা।

2. ফেরেশতাদের প্রতি ঈমান
ফেরেশতারা আল্লাহর নূর থেকে সৃষ্ট বান্দা— এ বিশ্বাস রাখা।

3. আল্লাহর কিতাবসমূহের প্রতি ঈমান
কুরআনসহ আল্লাহ প্রেরিত সব কিতাব সত্য— এ বিশ্বাস।

4. আল্লাহর রাসুলদের প্রতি ঈমান
আদম (আ.) থেকে মুহাম্মদ (স.) পর্যন্ত সব নবী-রাসুল সত্য— এ বিশ্বাস।

5. কিয়ামত/আখিরাতের প্রতি ঈমান
মৃত্যুর পর পুনরুত্থান, হিসাব-নিকাশ, জান্নাত-জাহান্নাম ইত্যাদিতে বিশ্বাস।

6. তাকদীরের প্রতি ঈমান

ভালো-মন্দ সবকিছু আল্লাহর নির্ধারণ অনুযায়ী হয়— এ দৃঢ় বিশ্বাস।

৩. ঈমানের তিনটি স্তর

ঈমান শুধু মুখের কথা নয়—
অন্তর, মুখ এবং কর্ম— এই তিনটি একত্রে পূর্ণ ঈমান গঠন করে।

(১) হৃদয়ের আমল ,বিশ্বাস ,ভালোবাসা ,ভয় ও ভক্তি ,আল্লাহর ওপর ভরসা

(২) জবান/মুখের আমল ,কালিমা শাহাদাত উচ্চারণ ,কুরআন তিলাওয়াত ,দোয়া, যিকির

(৩) অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের আমল ,সালাত ,সিয়াম ,যাকাত ,সৎকাজ করা ও অন্যায় থেকে বিরত থাকা

৪. ঈমানের বৈশিষ্ট্য

ঈমান—
বাড়ে— সৎকাজ, ইবাদত, তাকওয়ার মাধ্যমে
কমে— পাপ, গাফেলতি, নিষেধ অমান্য করার মাধ্যমে

৫. কেন ঈমান জরুরি?

মুক্তির একমাত্র পথ ঈমান ,আখিরাতে সফলতা ঈমানের ওপর নির্ভর করে ,জীবনে শান্তি, স্থিরতা ও নিরাপত্তা এনে দেয় ,আল্লাহর দয়া ও সাহায্যের দরজা খুলে যায়।

কালিমা নিয়ে আলোচনা

কালিমা ইসলামের মৌলিক বিশ্বাসের ভিত্তি। মুসলমানের ঈমান, আকীদা ও আমল—সবকিছুই কালিমার ওপর প্রতিষ্ঠিত। এখানে কালিমা "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ"–এর বিস্তারিত ব্যাখা তুলে ধরা হলো।

কালিমার বিস্তারিত ব্যাখ্যা

১. "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ"

এর অর্থ:
"আল্লাহ ছাড়া আর কোন সত্য উপাস্য নেই।"

(ক) লা ইলাহা – এর অর্থ ও আলোচনা

“লা ইলাহা” মানে—

আল্লাহ ছাড়া পৃথিবীতে যাদেরকে উপাস্য ধরা হয়,

যাদের কাছে সাহায্য চাওয়া হয়,

যাদের উদ্দেশ্যে কুরবানী/মানত করা হয়,

যাদের ভয় বা আশা মানুষ লালন করে—

এদের কেউই ইলাহ (উপাস্য) হওয়ার যোগ্য নয়।

অর্থাৎ—

সব ভুয়া উপাস্যকে অস্বীকার করা।

এটি ঈমানের “নাফি” (অস্বীকার) অংশ।

(খ) ইল্লাল্লাহ – এর অর্থ ও আলোচনা

“ইল্লাল্লাহ” মানে—

শুধু আল্লাহই সত্য উপাস্য।

শুধু তিনিই সৃষ্টি করেন, রিযিক দেন, পরিচালনা করেন, মৃত্যুর পর জীবন দিবেন, দোয়া কবুল করেন।

এটি ঈমানের “ইস্‌বাত” (প্রতিষ্ঠা) অংশ।

সারকথা:

আল্লাহ ছাড়া কারও সামনে মাথা নত নয়।

কারও কাছে প্রার্থনা নয়।

কারও জন্য কুরবানী নয়।

কারও ওপর সৃষ্টিকর্তার ক্ষমতা আরোপ নয়।

কালিমার এই অংশ মানুষের জীবনের সব আমলে “তাওহীদ” প্রতিষ্ঠা করে।

২. “মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ”

এর অর্থ:

“মুহাম্মাদ (সা.) আল্লাহর প্রেরিত রাসূল।”

এর বিস্তারিত ব্যাখা

এই বাক্য স্বীকার করার মাধ্যমে একজন মুসলিম স্বীকার করে—

(ক) নবী মুহাম্মাদ (সা.) সত্য রাসূল

তিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে পাঠানো হয়েছেন মানুষের কাছে সঠিক পথ দেখানোর জন্য।

(খ) তাঁর নির্দেশ/বিধান মানা ফরজ

তাঁর আদেশ মানা
তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থাকা
তাঁর দেখানো পথে চলা
এগুলো ঈমানের অপরিহার্য অংশ।

(গ) তাঁর আনীত কিতাব ও শরিয়া সর্বশেষ

কুরআন—
শেষ আসমানি গ্রন্থ
এর বিধান আজও পূর্ণাঙ্গ
এর শিক্ষা থেকে বিচ্যুত হওয়া ভুল পথ

(ঘ) কারও কথা তাঁর কথার বিরুদ্ধে গ্রহণযোগ্য নয়

কোনো মতবাদ, রীতি, কুসংস্কার বা প্রথা তাঁর বিরুদ্ধ হলে তা গ্রহণযোগ্য নয়।

কালিমার মূল বার্তা

১. ঈমানের ভিত্তি—তাওহীদ
আল্লাহ এক, তাঁর সত্তা ও গুণে কাউকেই শরিক করা যাবে না।
২. রাসূলের অনুসরণ—আল্লাহর অনুসরণ
আল্লাহর ইবাদত ঠিকভাবে করতে হলে রাসূলের নির্দেশ মানতেই হবে।
৩. জীবন পরিচালনা
কালিমা শুধু মুখে বলা নয়;

চিন্তায়,কাজে,সমাজে,ইবাদতে,আখলাকে, তাওহীদ প্রতিষ্ঠা করাই হল কালিমার বাস্তব রূপ।

কালিমার ফলাফল

গুনাহ ক্ষমা,জাহান্নাম থেকে মুক্তি
জান্নাতের দরজা উন্মুক্ত,ঈমানের দৃঢ়তা,দুনিয়ায় শান্তি ও নিরাপত্তা
রাসূল (সা.) বলেছেন—
যে ব্যক্তি আন্তরিকভাবে “লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ” বলবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

কালিমা কবুল হওয়ার শর্ত

কালিমা কবুল হওয়ার শর্ত (شروط لا إله إلا الله) ইসলামী আকীদার খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। শুধুমাত্র মুখে কালিমা বলা যথেষ্ট নয়—এটি হৃদয়, জিহ্বা ও আমলের মাধ্যমে সম্পূর্ণভাবে মানা জরুরি।
এখানে কালিমা কবুল হওয়ার ৭টি শর্ত বিস্তারিতভাবে তুলে ধরা হলো:

কালিমা কবুল হওয়ার শর্ত (৭টি)

১) জ্ঞান (العلم – ইলম থাকা)

কালিমার প্রকৃত অর্থ জানা—
"আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই"—এর বাস্তব ধারণা থাকতে হবে।
বিস্তারিত
আল্লাহর সাথে কাউকে শরিক করা যায় না,
আল্লাহ ছাড়া কারও কাছে দোয়া করা যায় না,
আল্লাহ ছাড়া কারও উপর পূর্ণ ভরসা করা যায় না—
এসব জানা জরুরি।

২) নিশ্চিত বিশ্বাস (اليقين – ইয়াকিন থাকা)
কালিমার অর্থ নিয়ে কোনো সন্দেহ থাকা যাবে না।
বিস্তারিত আল্লাহর তাওহীদ সম্পর্কে ১০০% নিশ্চিত হতে হবে।
ঈমান সন্দেহে নষ্ট হয়ে যায়।
কালিমার অর্থ ও সত্যতা সম্পর্কে মন পুরোপুরি নিশ্চিত হওয়া জরুরি।

৩) আন্তরিকতা (الإخلاص – ইখলাস থাকা)

শুধু আল্লাহর জন্যই কালিমা বলা ও আমল করা।

বিস্তারিত

দেখানো বা মানুষের প্রশংসার জন্য নয়।

দ্বীনকে শুধু আল্লাহর উদ্দেশ্যেই পালন করা।

রিয়া, স্বার্থ বা অন্য কারও খুশির জন্য ঈমান গ্রহণ করলে তা গ্রহণযোগ্য নয়।

৪) সত্যতা (الصدق – সদক থাকা)

জিহ্বা ও হৃদয়ের কথা একই হওয়া।

মুখে বলা আর ভেতরে গোপনে অস্বীকার—এটি মুনাফিকদের বৈশিষ্ট্য।

বিস্তারিত

মন থেকে সত্যিকারভাবে বিশ্বাস করতে হবে।

হৃদয় ও জিহ্বা এক হওয়া জরুরি।

৫) ভালোবাসা (المحبة – মাহাব্বত থাকা)

কালিমা, আল্লাহ, তাঁর রাসূল, ও ইসলামকে আন্তরিকভাবে ভালোবাসা।

বিস্তারিত

কালিমার দাবি অনুযায়ী জীবন গড়তে ভালোবাসা থাকতে হবে।

হারামকে ঘৃণা করা, হালালকে ভালোবাসা—এটিও এর অংশ।

আল্লাহর আদেশ পালন করতে ভালোবাসা।

৬) মেনে নেওয়া (القبول – কুবুল থাকা)

আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতিটি আদেশ ও নিষেধকে স্বীকার করা।

বিস্তারিত

কালিমা বলে কিন্তু শরিয়ত মানে না—এটি সঠিক ঈমান নয়।

কুরআন-হাদিসের বিধানকে মেনে নেওয়া ঈমানের অংশ।

ইসলামি বিধান অস্বীকার করলে কালিমা গ্রহণযোগ্য থাকে না।

৭) আনুগত্য (الانقياد – ইনকিয়াদ থাকা)

কালিমার দাবী অনুযায়ী কাজ করা, আল্লাহর আদেশ মানা ও তাঁর নিষেধ থেকে বাঁচা।

বিস্তারিত

নামাজ, রোজা, জাকাত—এসব পালন করা।

হারাম থেকে দূরে থাকা।

জীবনকে আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী পরিচালনা করা।

ঈমানের সংজ্ঞা: আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লা ম বিধান-আহকাম হাসিল করেছেন এবং অকাট্য দলীল দ্বারা তা প্রমাণিত হয়েছে তার কোন একটি বাদ না দিয়ে সব গুলোকে মনে প্রাণে বদ্ধমূল ভাবে বিশ্বাস করা।

আল্লাহ তা'আলার আদেশ-নিষেধ সঠিকভাবে এবং পূর্ণভাবে আমল করার মাধ্যমে এ ঈমান কামিল বা শক্তিশালী হয়।

আর আল্লাহর আদেশ নিষেধ পালনে এটি করলে ঈমান নাকেস বা দুর্বল হয়ে পড়ে এবং ঈমানের নূর-নষ্ট হয়ে যায়। এ অবস্থা দীর্ঘদিন চলতে থাকলে এবং তাওবা না করলে আল্লাহ না করুন ঈমান নষ্ট হয়ে যেতে পারে।

কুফর এর সংজ্ঞা: আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যদি বিধান-আহকাম হাসিল করেছেন এবং অকাট্য দলীল দ্বারা তা প্রমাণিত হয়েছে তার কোন বিষয় সম্বন্ধে অন্তরে সন্দেহ পোষণ করা, তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করা, ঠাট্টা মজা করা। উল্লেখিত কাজের দ্বারা ঈমান নষ্ট হয়ে গেলে তার পিছের জীবনের সকল ইবাদত-বন্দেগী ও আমল নষ্ট হয়ে যায় এবং বিবাহিত হলে তার বিবাহ বাতিল হয়ে যায়। আল্লাহ না করুন এ অবস্থা কারো হলে তার জন্য জরুরী হল, নতুনভাবে কালেমা পড়ে তওবা ইস্তিগফার করে ঈমান দোহরায়ে নিয়ে বিবাহ দোহরায়ে নেয়া।

এখান থেকে ঈমান মুফাসসালে বর্ণিত বিষয়গুলো ব্যাখ্যা সহকারে পেশ করা হচ্ছে।

১. আল্লাহ তা'আলার ওপর ঈমান

আল্লাহ তা'আলার ওপর ঈমান আনার অর্থ এ কথা বিশ্বাস করা যে, আল্লাহ এক, অদ্বিতীয় ও অতুলনীয়। তাঁর কোন প্রকার অংশ বা অংশীদার বা শরীক নেই, তাঁর কোন কিছুর অভাব নেই। তিনিই সকলের সব অভাব পূরণকারী। তিনি কারো পিতা নন, পুত্রও নন, তাঁর সমতুল্য কেউ নেই। একমাত্র তিনিই সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা, রক্ষাকর্তা ও পালনকর্তা। কোন জ্ঞান বা চক্ষু আল্লাহ তা'আলাকে আয়ত্ত করতে পারে না। তিনি চিরকাল আছেন এবং থাকবেন। তিনি অনাদি ও অনন্ত। আল্লাহ তা'আলা ছাড়া আর কোন মা'বুদ নাই। তিনিই একমাত্র ইবাদত পাওয়ার যোগ্য।

সারকথা, **আল্লাহ তা'আলার বিষয়ে তিনটি কথা অবশ্যই মানতে হবে।**

ক. তিনি এক, অদ্বিতীয় ও অতুলনীয়। তাঁর কোন শরীক নেই। সৃষ্ট জীবের সাথে তাঁর কোন তুলনা হয় না।

খ. তাঁর অনেকগুলো অনাদি-অনন্ত সিফাত বা গুণ আছে, সেগুলো একমাত্র তাঁর জন্যেই নির্ধারিত। সেসব গুনের মধ্যে অন্য কেউ শরীক নেই। যেমন: তিনিই সৃষ্টিকর্তা, রিযিকদাতা, হায়াত-মওতদাতা, বিধানদাতা, গায়েব সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত। তিনি চিরঞ্জীব, তাঁর মৃত্যু নেই। অন্য সবকিছুই ক্ষয়শীল ও ধ্বংসশীল,কিন্তু তাঁর ক্ষয়ও নেই, ধ্বংসও নেই। সবকিছুর ওপর তাঁর আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত। সবকিছুর ওপরই তাঁর ক্ষমতা চলে। আল্লাহ তা'আলা কারো মুখাপেক্ষী নন, সব-ই তাঁর মুখাপেক্ষী। তিনি সর্বশক্তিমান। তিনি আগুণকে পানি এবং পানিকে আগুণ করতে পারেন। এই যে লক্ষ লক্ষ বছর ধরে আকাশ, বাতাস, চন্দ্র সূর্য ইত্যাদি বিদ্যমান, তিনি হুকুম করলে মুহূর্তের মধ্যে এসব নিস্তনাবুদ হয়ে যাবে। তিনি সর্বজ্ঞ, তিনি না জানেন-এমন কিছুই নেই। মনের মধ্যে যে ভাবনা বা কল্পনা উদয় হয়, তাও তিনি জানেন। তিনি সবকিছুই দেখছেন। সবকিছুই শুনছেন। মৃদু আওয়াজ এমনকি ক্ষীণ থেকে ক্ষীণ আওয়াজও তিনি শুনেন। গাইবের বিষয় একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই জানেন। তিনি ছাড়া আর কেউ গাইব জানেন না। এমনকি নবী-রাসূল অলী ও নন। আল্লাহ তা'আলাই একমাত্র হাযির-নাযির। তিনি ছাড়া আর কেউ হাযির নাযির নন। এমনকি নবী-অলীগণ ও নন। তিনি যা ইচ্ছা, তা-ই করতে পারেন। কোন পীর, ওলী, পয়গাম্বর বা ফেরেশতা তাঁর ইচ্ছাকে রদ বা প্রতিহত করতে পারে না। তিনি আদেশ ও নিষেধ জারি করেন। তিনি একমাত্র বন্দেগীর উপযুক্ত। তিনি ব্যতীত অন্য কেউ ইবাদতের যোগ্য হতে পারে না। অন্য কারো ইবাদত-বন্দেগী করা যায় না।

তাঁর কোন অংশীদার কিংবা সহকর্মী বা উযীর-নাযীর নেই। তিনি একক কর্তৃত্বের অধিকারী। তিনিই সর্বোপরি বাদশাহ, রাজাধিরাজ; সবই তাঁর বান্দা ও গোলাম। তিনি বান্দাদের ওপর বড়ই মেহেরবান। তিনি সব দোষ-ত্রুটি হতে পবিত্র। তাঁর মাঝে আদৌ কোন রকমের দোষ-ত্রুটি নেই। তাঁর ক্রিয়া-কর্ম, আদেশ-নিষেধ সবই ভালো ও মঙ্গলময়, কোন একটিতেও বিন্দুমাত্র অন্যায় বা দোষ নেই। তিনিই বিপদ-আপদ দেন এবং বিপদ-আপদ হতে উদ্ধার করেন, অন্য কেউ কোন প্রকার বিপদ-আপদ হতে মুক্তি দিতে পারে না।

প্রকৃত সম্মান ও মর্যাদা তাঁরই। তিনিই সকল সম্মান ও মর্যাদার অধিপতি। তিনিই প্রকৃত মহান। একমাত্র তিনিই নিজেকে নিজে বড় বলতে পারেন। এতদ্ব্যতীত অন্য কারো এ রকম বলার ক্ষমতা ও অধিকার নেই। তিনিই সবকিছু সৃষ্টি করেছেন, এবং সৃষ্টি করবেন। তিনি এমন দয়ালু যে, দয়া করে অনেকের গুনাহ তিনি মাফ করে দেন। তিনি ক্ষমাশীল। তিনি অত্যন্ত পরাক্রমশালী। তাঁর প্রভাব ও প্রভুত্ব সকলের ওপর; কিন্তু তাঁর ওপর কারো প্রভাব বা প্রভুত্ব চলে না। তিনি বড়ই দাতা। সমস্ত জীবের ও যাবতীয় চেতন-অচেতন পদার্থের

আহার তিনি দান করেন। তিনি রুযীর মালিক। রুযী কমানো-বাড়ানো তাঁরই হাতে। তিনি যার রুযী কমাতে ইচ্ছা করেন, তার রুযী কম করে দেন। যার রুযী বাড়াতে ইচ্ছা করেন, বাড়িয়ে দেন। কাউকে উচ্চপদস্থ বা অপদস্থ করার ক্ষমতা তাঁরই হাতে। তিনি যাকে ইচ্ছা সম্মান দান করেন, আবার যাকে ইচ্ছা অপমানিত করেন। এসবই তাঁরই ক্ষমতায়, তাঁরই ইখতিয়ারে। অন্য কারো এতে কোন রকম ক্ষমতা বা অধিকার নেই। তিনি প্রত্যেকের যোগ্যতা অনুসারে যার জন্যে যা ভালো মনে করেন, তার জন্যে তাই ব্যবস্থা করেন। তাতে কারো কোন প্রকার প্রতিবাদ করার অধিকার নেই।

তিনি ন্যায়পরায়ণ, তাঁর কোন কাজেই অন্যায় বা অত্যাচারের লেশমাত্র নেই। তিনি বড় সহিষ্ণু, অনেক কিছু সহ্য করেন। কত পাপিষ্ঠ তাঁর নাফরমানী করছে, তাঁর ওপর কত রকম দোষারোপ এবং তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ পর্যন্ত করছে, তারপরও তিনি তাদের রিযিক জারি রেখেছেন। তিনি এমনই কদরশিনাস-গুণগ্রাহী এবং উদার যে, তাঁর আদৌ কোন প্রয়োজন না থাকা সত্ত্বেও মানুষ তাঁর ইবাদত-বন্দেগী করলে এবং তাঁর আদেশ পালন করলে, তিনি তার বড়ই কদর করেন এবং সন্তুষ্ট হয়ে আশাতীত রূপে পুরস্কার দান করেন। তিনি এমনই মেহেরবান ও দয়ালু যে, তাঁর নিকট দরখাস্ত করলে [অর্থাৎ দু'আ করলে। তিনি তা মঞ্জুর করেন। তাঁর ভাণ্ডার অফুরন্ত, তাঁর ভাণ্ডারে কোন কিছুরই অভাব নেই।

তিনি অনাদি-অনন্তকাল ব্যাপী সকল জীব-জন্তু ও প্রাণিজগতের আহার যোগান দিয়ে আসছেন। তিনি জীবন দান করেছেন, ধন-রত্ন দান করছেন, বিদ্যা-বুদ্ধি দান করেছেন। অধিকন্তু আখিরাতেও অসংখ্য ও অগণিত সাওয়াব ও নেয়ামত দান করবেন। কিন্তু তাঁর ভাণ্ডার তবুও বিন্দুমাত্র কমেনি বা কমবে না।

তাঁর কোন কাজই হিকমত ও মঙ্গল ছাড়া নয়। কিন্তু সব বিষয় সকলের বুঝে আসে না। তাই নির্বুদ্ধিতা বশত কখনো না বুঝে দিলে দিলে বা মুখে প্রতিবাদ করে ঈমান নষ্ট করা উচিত নয়। তিনি সব কর্ম সমাধানকারী। বান্দা চেষ্টা করবে, কিন্তু সে কর্ম সমাধানের ভার তাঁরই কুদরতী হাতে ন্যস্ত। তিনি সব কিছু সৃষ্টি করেছেন এবং কিয়ামতের দিন পুনর্বার সকলকে জীবিত করবেন। তিনিই জীবন দান করেন এবং তিনিই মৃত্যু দেন। তাঁর হাকীকত ও স্বরূপ এবং তিনি যে কত অসীম, তা কারো বোঝার ক্ষমতা নেই। কেবলমাত্র তাঁর সিফাত অর্থাৎ গুণাবলী ও তাঁর কার্যাবলীর দ্বারাই তাকে আমরা চিনতে পারি।

মানুষ পাপ করে যদি খাঁটিভাবে তাওবা করে, তবে তিনি তা কবুল করেন। যে শাস্তির উপযুক্ত, তাকে তিনি শাস্তি দেন। তিনি হিদায়ত দেন। তাঁর নিদ্রা নেই। সমস্ত বিশ্বজগতের রক্ষণাবেক্ষণ ও তত্ত্বাবধানে তিনি বিন্দুমাত্রও ক্লান্ত হন না। তিনিই সমস্ত বিশ্বের রক্ষক।

ফলকথা এই যে, সৎ ও মহৎ যত গুণ আছে, অনাদিকাল যাবৎ সে সব আল্লাহ তা'আলার মধ্যে আছে এবং চিরকাল থাকবে। কিন্তু কোন দোষ ত্রুটির লেশমাত্রও তাঁর মধ্যে নেই। আল্লাহ তা'আলার গুণ সম্বন্ধে কুরআন মজীদে এবং হাদীস শরীফের কোন কোন জায়গায় এরূপ উল্লেখ আছে যে, তিনি আশ্চর্যান্বিত হন, হাসেন, কথা বলেন, দেখেন, শুনেন, সিংহাসনাসীন হন, নিম্ন আসমানে অবতীর্ণ হন। তাঁর হাত, পা, মুখ ইত্যাদি আছে। এসব ব্যাপারে কখনো বিভ্রান্তিতে পড়তে বা তর্ক-বিতর্ক করতে নেই। সহজ-সরলভাবে আমাদের আক্বীদা ও একীন এই রাখা উচিত যে, আমাদের বা অন্য কোন সৃষ্টজীবের মতো তাঁর ওঠা-বসা বা হাত-পা তো নিশ্চয়ই নয়। তবে কেমন? তা আমাদের জ্ঞানের বাইরে। প্রিয় ভ্রাতৃবৃন্দ! সাবধান! সাবধান!!! যেন শয়তান ধোঁকা দিয়ে গোলকধাঁধায় না ফেলতে পারে। একিনী আক্বীদা ও অটল বিশ্বাস রাখবেন যে, আমাদের বা অন্য কোন সৃষ্ঠজীবের সাদৃশ্য হতে আল্লাহ তা'আলা সম্পূর্ণ পবিত্র ও মহান।
এ দুনিয়াতে জাগ্রত অবস্থায় চর্ম চোখে কেউ আল্লাহ তা'আলাকে দেখতে পারেনি। কখনো পারবেও না। তবে জান্নাতে গিয়ে জান্নাতীরা আল্লাহ পাকের দীদার লাভ করবে। জান্নাত এটাই-সর্বোৎকৃষ্ট নেয়ামত হবে।

গ. একমাত্র তিনিই মাখলুকের ইবাদত-বন্দেগী পাওয়ার উপযুক্ত। আর কেউ ইবাদত পাওয়ার উপযুক্ত নয়। আল্লাহ তা'লার ওপর ঈমান আনার অর্থ শুধু আল্লাহ তা'আলার অস্তিত্ব স্বীকার করা নয়; বরং অস্তিত্ব স্বীকার করার সাথে সাথে তার উপরোক্ত গুণবাচক কথাগুলো স্বীকার করাও জরুরী। নতুবা আল্লাহপাকের ওপর সম্পূর্ণরূপে ঈমান আনা হবে না এবং সে ঈমান গ্রহণযোগ্যও হবে না।

২. ফেরেশতাগণের ওপর ঈমান

ফেরেশতাগণের ওপর ঈমান আনার অর্থ হলো এ কথা বিশ্বাস করা যে, মহান আল্লাহ এক ধরণের মাখলুককে নূরের দ্বারা সৃষ্টি করে তাদেরকে আমাদের চক্ষুরঅন্তরালে রেখেছেন। তাদেরকে ফেরেশতা বলে। তাঁরা পুরুষ বা মহিলা কোনটিই নন। বরং তাঁরা ভিন্ন ধরনের মাখলুক। অনেক ধরণের কাজ আল্লাহ তা'আলা তাদের ওপর সোপর্দ করে রেখেছেন। যেমন: নবীগণের আ. নিকট অহী আনয়ন করা, মেঘ পরিচালনা করা, রুহু কবয করা, নেকী-বদী লিখে রাখা ইত্যাদি। তাঁরা সম্পূর্ণ নিষ্পাপ। তাঁরা বিন্দুমাত্র আল্লাহর নাফরমানী করেন না। তাঁরা আল্লাহর প্রিয় ও ফরমাবরদার বান্দা। তাঁদের মধ্যে চারজন ফেরেশতা যথা: হযরত জিবরাঈল আ. হযরত মীকাঈল আ.. হযরত ইসরাফীল আ. ও হযরত আযরাঈল আ. অতিপ্রসিদ্ধ।

জিন সম্বন্ধে আক্বীদা

আরেক প্রকার জীবকে আল্লাহ তা'আলা আগুনের দ্বারা সৃষ্টি করে আমাদের চক্ষুর অগোচর করে রেখেছেন। তাদেরকে জিন বলে। তাদের মধ্যে ভালো-মন্দ সবরকম হয়। তারা নারী-পুরুষও বটে এবং তাদের সন্তানাদিও হয়। তাদের খানা-পিনার প্রয়োজনও হয়। জিন মানুষের ওপর আছর করতে পারে। তাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি প্রসিদ্ধ ও বড় দুষ্ট হচ্ছে 'ইবলিশ শয়তান'। হাশরের ময়দানে জিনদেরও হিসাব-নিকাশ হবে। এ কথা কুরআনে কারীমে উল্লেখ আছে। সুতরাং তা বিশ্বাস করা ঈমানের অংশ।

৩. আল্লাহর প্রেরিত কিতাবসমূহের ওপর ঈমান:

আল্লাহ তা'আলার প্রেরিত কিতাবসমূহের ওপর ঈমান আনার অর্থ হলো, এ কথা বিশ্বাস করা যে, আল্লাহ তা'আলা মানব জাতি ও জিন জাতির হিদায়াতের জন্যে ছোট-বড় বহু কিতাব হযরত জিবরাঈল আ. এর মাধ্যমে পয়গাম্বরগণের আ. ওপর নাযিল করেছেন, তারা সে সব কিতাবের দ্বারা নিজ নিজ উম্মতকে দ্বীনের কথা শিখিয়েছেন। উক্ত কিতাবসমূহের মধ্যে চারখানা কিতাব বেশি প্রসিদ্ধ, যা প্রসিদ্ধ চারজন রাসূলের আ. ওপর নাযিল করা হয়েছে। তার মধ্যে কুরআন শরীফ সর্বশেষ কিতাব। এরপরে আর কোন কিতাব নাযিল হবে না। কিয়ামত পর্যন্ত কুরআন শরীফের হুকুমই চলতে থাকবে। পবিত্র কুরআনের কোন সূরা আয়াত এমনকি কোন শব্দ হরকত, নুকতার মধ্যে এমনিভাবে অর্থের মাঝেও বিন্দুমাত্র পরিবর্তন, পরিবর্ধন বা বিলুপ্তি আসেনি এবং কিয়ামত পর্যন্ত আসাও সম্ভব নয়। কারণ স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা কুরআনের হিফাযতের ওয়াদা করেছেন এবং তা নিজের দায়িত্বে রেখেছেন। অন্যান্য কিতাবগুলোকে বেদ্বীন লোকেরা অনেক কিছু পরিবর্তন করে ফেলেছে। কারণ আল্লাহ তা'আলা দুনিয়াতে সেগুলোর হিফাযতের ওয়াদা করেন নি। পবিত্র কুরআনের প্রতিটি সূরা, প্রতিটি আয়াত, প্রতিটি হরফ এমনকি প্রতিটি নুকতাহ ও হরকতের প্রতি ঈমান রাখতে হবে। কোন একটি অস্বীকার করলে ঈমান থাকবে না। কাফের হয়ে যাবে।কুরআন শরীফ ও তার ব্যাখ্যা হাদীস শরীফে তিনি দ্বীন সম্বন্ধীয় সব কথা বর্ণনা করে করে দিয়েছেন। কোন অংশ গোপন রাখেন নি। সুতরাং, এখন নতুন কোন কথা বা প্রথা চালু করা দুরস্ত নয়। দ্বীনের ব্যাপারে এরূপ নতুন কথাকে ইলহাদ বা বিদ'আত বলে। যা অত্যন্ত মারাত্মক গুনাহ ও পথভ্রষ্টতা। কুরআন-হাদীসের মনগড়া ব্যাখ্যা দেয়া কুফরী কাজ। কোন ফরযকে অস্বীকার করা কুফরী কাজ। তেমনিভাবে কোন হালালকে হারাম মনে করা বা কোন অকাট্য হারাম বা গুনাহকে হালাল হিসাবে বিশ্বাস করা কুফরী। এর দ্বারা ঈমান চলে যায়।

৪. নবী-রাসূল আ. এর ওপর ঈমান:

নবী-রাসূল আ. এর ওপর ঈমান আনার অর্থ এ কথা বিশ্বাস করা যে, আল্লাহ তা'আলা মানুষের হিদায়াতের জন্যে এবং তাদেরকে সঠিক পথ দেখাবার জন্য স্বীয় বান্দাদের মধ্যে হতে বাছাই করে বহুসংখ্যক পয়গাম্বর অর্থাৎ নবী-রাসূল আ. মনোনীত করে দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন। যাতে করে মানুষ আল্লাহর সন্তুষ্টি হাসিল করে দুনিয়াতে কামিয়াব হতে পারে এবং পরকালে দোযখ থেকে মুক্তি লাভ করে বেহেশত হাসিল করতে পারে।

পয়গাম্বরগণ সকলেই মাসুম বা নিষ্পাপ। তাঁরা কোন প্রকার পাপ করেন না। নবীগণ মানুষ। তাঁরা খোদা নন। খোদার পুত্র নন। খোদার রূপান্তর (অবতার) নন। বরং তাঁরা হলেন আল্লাহর প্রতিনিধি। নবীগণ আল্লাহর বাণী হুবহু পৌঁছে দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁদের সঠিক সংখ্যা কুরআন শরীফ বা নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাদীস শরীফে বর্ণনা করেন নি। কাজেই নিশ্চিতভাবে তাঁদের সঠিক সংখ্যা কেউ বলতে পারে না। এ কথা যদি ও প্রসিদ্ধ যে, এক লক্ষ চব্বিশ হাজার পয়গাম্বর দুনিয়াতে এসেছেন কিন্তু কোন সহীহ হাদীস দ্বারা তা প্রমাণিত নয়। শুধু এতটুকু বলা যায় যে, বহুসংখ্যক পয়গাম্বর দুনিয়াতে এসেছেন। আল্লাহ তা'আলার হুকুমে তাঁদের দ্বারা অনেক অসাধারণ ও অলৌকিক ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। ঐ সব ঘটনাকে মু'জিযা বলে। নবীগণের মু'জিযাসমূহ বিশ্বাস করাও ঈমানের অঙ্গ।

পয়গাম্বরগণের আ. মধ্যে সর্বপ্রথম দুনিয়াতে আগমন করেছেন হযরত আদম আ. এবং সর্বশেষ অথচ সর্বপ্রধান এবং সর্বশ্রেষ্ঠ হচ্ছেন আমাদের নবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা আহমদ মুজতাবা সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম। তাঁর পরে অন্য কেউ দুনিয়াতে নবী বা রাসূল হিসেবে আগমন করেননি এবং করবেনও না। হযরত ঈসা আ. কিয়ামতের পূর্বে যদিও আগমন করবেন, কিন্তু তিনি তো পূর্বেই নবী ছিলেন। নতুন নবী হিসেবে তিনি আগমন করবেন না। আমদের নবীখাতামুন নাবিয়্যীন বা শেষনবী। তাঁর পরে নতুনভাবে আর কোন নবী আসবেন না; তারপর আসল বা ছায়া কোনরূপ নবীই নাই। বরং তাঁর আগমনের মাধ্যমে নবুওয়াতের দরজা বন্ধ হয়ে গেছে। আমাদের নবীর নবুওয়াত প্রাপ্তির পর থেকে কিয়ামত পর্যন্ত সমগ্র পৃথিবীতে যত জিন বা ইনসান ছিল, আছে বা সৃষ্টি হবে, সকলের জন্যেই তিনি নবী। সুতরাং কিয়ামত পর্যন্ত সমস্ত পৃথিবীতে একমাত্র তাঁরই হুকুম এবং তরীকা সকলের মুক্তি ও নাজাতের জন্যে অদ্বিতীয় পথ হিসেবে বহাল থাকবে। অন্য কোন ধর্ম, তরীকা বা ইজম এর অনুসরণ কাউকে আল্লাহর দরবারে কামিয়াব করতে পারবে না। আমাদের নবীর পরে অন্য কেউ নবী হয়েছেন বা নবী হবেন বলে বিশ্বাস করলে তার ঈমান নষ্ট হয়ে যাবে।

তেমনিভাবে কেউ নতুন নবী হওয়ার দাবি করলে বা তার অনুসরণ করলে, সেও কাফির বলে গণ্য হবে।

হযরত ঈসা আ. এখনও আসমানে জীবিত আছেন। তাঁকে জীবিত অবস্থায় আসমানে উঠিয়ে নিয়েছেন, ইহা সত্য। কুরআন হাদীসে প্রমাণিত। তাই ইহা বিশ্বাস করতে হবে, অন্যথায় ঈমান থাকবে না, তিনি কিয়ামতের পূর্বে আসমান থেকে জমিনে অবতরণ করবেন। আমাদের নবীর অনুসারী হয়ে। হযরত ঈসা আ.- এর ব্যাপারে পুত্রবাদ ও কর্তৃত্বদের বিশ্বাস কুফরী।

দুনিয়াতে যত পয়গাম্বর এসেছেন, সকলেই আমাদের মাননীয় ও ভক্তির পাত্র। তাঁরা সকলেই আল্লাহর হুকুম প্রচার করেছেন। তাঁদের মধ্যে পরস্পরে কোন বিরোধ ছিল না। সকলেই পরস্পর ভাই ভাই ছিলেন। হ্যাঁ, আল্লাহ তা'আলা অবশ্য হিকমতের কারণে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন হুকুম জারি করেছেন। আর এই সামান্য বিভিন্নতাও শুধু আমলের ব্যাপারে, ঈমান আকীদার ব্যাপারে নয়। আকীদাসমূহ আদি হতে অন্ত পর্যন্ত চিরকাল এক। আক্বীদার মধ্যে কোন প্রকার রদবদল বা পরিবর্তন হয়নি, আর হবেও না কখনো। পয়গাম্বরগণ সকলেই কামিল ছিলেন। কেও নাকিস বা অসম্পূর্ণ ছিলেন না। অবশ্য তাঁদের মধ্যে কারো মর্যাদা ছিল বেশি, কারো মর্যাদা ছিল তুলনামূলকভাবে কম। সকল নবী নিজ নিজ কবরে জীবিত আছেন। এজন্য নবীগণকে 'হায়াতুন্নবী' বলা হয়।

উল্লেখ্য যে, আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মর্তবা সর্বাপেক্ষা বেশি। তাই বলে নবীগণের মধ্যে তুলনা করে একজনকে বড় এবং একজনকে হেয় বা ছোট করে দেখানো বা বর্ণনা করা নিষেধ।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম-এর সমস্ত কথা মেনে নেয়া জরুরী। তাঁর একটি কথাও অবিশ্বাস করলে বা সে সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করলে কিংবা তা নিয়ে হাসি-ঠাট্টা করলে বা দোষ বের করলে ঈমান নষ্ট হয়ে যায়।ঈমানের জন্যে আমাদের নবীর সশরীরে জাগ্রত অবস্থায় মি'রাজ ভ্রমণের কথা বিশ্বাস করাও জরুরী। যে মি'রাজ বিশ্বাস করে না, সে বেদ্বীন। তার ঈমান নষ্ট হয়ে গেছে।

৫. কিয়ামত দিবসের ওপর ঈমান

কিয়ামত দিবসের ওপর ঈমান আনার অর্থ-কুরআন ও হাদীসে কিয়ামতের যতগুলো নিদর্শন বর্ণিত হয়েছে, তা নিশ্চয়ই ঘটবে-দৃঢ়ভাবে এ কথা বিশ্বাস করা। যেমন- বিশ্বাস করা যে, ইমাম মাহদী রহ. আবির্ভূত হবেন। তিনি অত্যন্ত ন্যায়পরায়ণতার সাথে বাদশাহী করবেন। 'কানা দাজ্জাল' অনেক অনেক ফিতনা-ফাসাদ করবে, তাকে খতম করার জন্য হযরত ঈসা আ. আসমান থেকে অবতীর্ণ হবেন এবং তাকে বধ করবেন। 'ইয়াজুজ মা'জুজ' অতিশক্তিশালী পথভ্রষ্ট শ্রেণীর মানুষ। তারা দুনিয়াতে ফিতনা-ফাসাদ ছড়িয়ে দেবে। অতঃপর আল্লাহর গযবে

তারা ধ্বংস হয়ে যাবে। 'দাব্বাতুল আরদ' নামে এক আশ্চর্য জানোয়ার পৃথিবীতে জাহির হবে এবং মানুষের সাথে কথা বলবে।

কিয়ামতের পূর্বে পশ্চিম দিক থেকে সূর্য উদিত হবে, তাওবার দরজা বন্ধ হয়ে যাবে এবং কুরআন শরীফ উঠে যাবে। এ ধরনের আরো অনেক ঘটনা ঘটবে। তারপরে কিছুদিনের মধ্যে সমস্ত মু'মিনগণ মারা যাবেন এবং সমস্ত দুনিয়া কাফিরদের দ্বারা ভরে যাবে। আর তাদের উপর কিয়ামত কায়িম হবে।সারকথা, কিয়ামতের সকল নিদর্শন যখন পূর্ণ হবে, তখন আল্লাহর নির্দেশে হযরত ইসরাফীল আ. শিঙ্গায় ফুঁক দিবেন। তাতে কতিপয় জিনিস ব্যতীত সব ধ্বংস হয়ে যাবে, আসমান চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে, সমস্ত জীবজন্তু মরে যাবে, যারা পূর্বে মারা গেছে, তাদের রুহ বেঁহুশ হয়ে যাবে। অনেক দিন এ অবস্থায় অতিবাহিত হবে। আল্লাহর নির্দেশে তারপর আবার-শিঙ্গায় ফুঁৎকার দেয়া হবে। তাতে সমস্ত আলম আবার জীবিত হয়ে উঠবে এবং কেয়ামতের ময়দানে সকলে একত্রিত হবে।

কিয়ামতের দিন সূর্য অতি নিকটে চলে আসবে। ফলে মানুষের খুব কষ্ট হবে। কষ্ট দূর করার জন্য লোকেরা হযরত আদম আ. থেকে শুরু করে বড় বড় নবীগণের আ. নিকট সুপারিশের জন্য যাবে। কিন্তু কেউ সুপারিশ করার সাহস পাবে না। অবশেষে আমাদের নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর শাফাআতে হিসাব-নিকাশ শুরু হবে।

মীযানের মাধ্যমে নেকী-বদীর হিসাব হবে। অনেকে বিনা হিসেবেই বেহেশতে চলে যাবে, আবার অনেককে বিনা হিসেবে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। হিসাবের পর নেককারদের ডান হাতে এবং বদকারদের বাম হাতে আমলনামা দেয়া হবে। সেদিন জাহান্নামের উপরে অবস্থিত পুলসিরাতের উপর দিয়ে সকলকে পার হতে হবে। নেককার লোকেরা তা দ্রুত পার হয়ে যাবেন, কিন্তু বদকার লোকেরা পার হওয়ার সময় পুলসিরাতের নিচে অবস্থিত দোযখের মধ্যে পড়ে যাবে।

সেই কঠিন দিনে আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম উম্মতদেরকে হাউজে কাউসারের শরবত পান করাবেন। তা এমন তৃপ্তিকর হবে, যা পান করার পর পিপাসার নামমাত্র থাকবে না। জাহান্নামের মাঝে ভয়ানক অগ্নিকুণ্ডসহ বিভিন্ন রকম শাস্তির উপকরণ মহান আল্লাহ পূর্ব হতেই সৃষ্টি করে রেখেছেন। যার মধ্যে বিন্দুমাত্র ঈমান আছে, সে যত বড় পাপী হোক না কেন, স্বীয় পাপের শাস্তি ভোগ করবে, অতঃপর নবীগণের আ. কিংবা অন্যদের সুপারিশে দোযখ হতে মুক্তি লাভ করে কোন এক সময় বেহেশতে প্রবেশ করবে। আর যারা কুফরী করেছে, বা শিরকী করেছে, তারা যদি দুনিয়াতে অনেক ভাল কাজও করে থাকে, তথাপি তারা কখনো কিছুতেই দোযখ হতে মুক্তি পাবে না। দোযখীদের কখনো মৃত্যুও আসবে না। তারা চিরকাল শাস্তিই ভোগ করতে থাকবে এবং তাদের কোন আশা-আকাঙ্খা পূর্ণ হবে না।

দোযখের ন্যায় বেহেশতকেও আল্লাহ তা'আলা পূর্ব হতে সৃষ্টি করে রেখেছেন। সেখানে নেক লোকদের জন্যে অগণিত ও অকল্পনীয় শান্তির সামগ্রী ও নেয়ামত মওজুদ আছে। যে একবার বেহেশতে যাবে, তার আর কোন ভয় বা ভাবনাথাকবে না। এবং কোনদিন তাকে বেহেশত থেকে বের হতে হবে না। বরং চিরকাল সেখানে জীবিত অবস্থায় থেকে সুখ-শান্তি ভোগ করতে থাকবে।

বেহেশতের সকল নেয়ামতের মধ্যে আল্লাহ তা'আলার দীদার বা দর্শন লাভসর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট নেয়ামত। যদিও দুনিয়াতে জাগ্রত অবস্থায় চর্ম চোখে কেউ আল্লাহ তা'আলাকে দেখতে পাবে না, কিন্তু মু'মিনগণ বেহেশতের মধ্যে আল্লাহর দীদার লাভে ধন্য হবেন। বেহেশতের মধ্যে বাগ-বাগিচা, বালাখানা, হুর-গিলমান, বিভিন্ন রকম নহর ও নানারকম অকল্পনীয় সুস্বাদু খাদ্যসামগ্রী সর্বদা মওজুদ থাকবে। জান্নাতীদের দিলের কোন নেয়ামত ভোগ করার ইচ্ছা হওয়ার সাথে সাথে তা পূর্ণ হবে। দুনিয়াতে কাউকে নিশ্চিতভাবে জান্নাতী বা জাহান্নামী বলা যায় না। অবশ্য কুরআন-হাদীসে যাদের নাম নিয়ে জান্নাতী বা জাহান্নামী বলা হয়েছে, তাদের ব্যাপারে বলা যাবে। তবে কারোর ভাল আমল বা ভাল আখলাক দেখে তাকে ভাল মনে করা উচিত।

৬. তাকদীরের ওপর ঈমান

তাকদীরের ওপর ঈমান আনার অর্থ হচ্ছে, মনে-প্রাণে অটল বিশ্বাস রাখতে হবে যে, সমগ্র বিশ্বজগতে ভালো বা মন্দ যা কিছু হয়, সবই আল্লাহ তা'আলা পূর্ব হতেই জানেন, লাউহে মাহফুযে তা লিখে রেখেছেন এবং তিনি যেমন জানেন তেমনই হয়, তার মধ্যে কোন ব্যতিক্রম হয় না। আল্লাহই সবকিছুর সৃষ্টি কর্তা। তার ক্ষমতা সর্বব্যাপী। তার ক্ষমতা ছিন্ন করে বের হতে পারে, এমন কেউ নেই। তিনি সর্বজ্ঞ, আদি-অন্ত সবকিছুই তিনি সঠিকভাবে জানেন।

মানুষকে আল্লাহ তা'আলা ভাল-মন্দ বুঝবার এবং কাজ করার ক্ষমতা দান করেছেন এবং ইচ্ছাশক্তিও দান করেছেন। তার দ্বারা নিজ ক্ষমতায়, নিজ ইচ্ছায় সে পাপ ও পুণ্যের কাজ করে। পাপ কাজ করলে আল্লাহ তা'আলা অসন্তুষ্ট হন এবং পুণ্যের কাজ করলে সন্তুষ্ট হন। কাজ করা ভিন্ন কথা, আর সৃষ্টি করা ভিন্ন কথা। সৃষ্টি তো সবকিছুই আল্লাহ তা'আলা করেন। কিন্তু নিজের ইচ্ছানুযায়ী কাজ করার ক্ষমতা আল্লাহ তা'আলা মানুষকে দান করেছেন।

মানুষ জীবনভর যতই ভাল বা মন্দ থাকুক না কেন, যে অবস্থায় তার ইনতিকাল হবে, সে হিসেবে শান্তি বা শাস্তি পাবে। যেমন, এক ব্যক্তি সারাজীবন মু'মিন ছিল, কিন্তু মউতের পূর্বে ইচ্ছা পূর্বক কুফরী বা শিরকী কথা বললো বা ঈমান বিরোধী কাজ করলো, তাহলে সে কাফির সাব্যস্ত হবে। সুতরাং, দিলের মধ্যে আল্লাহর রহমতের আশা ও গযবের ভয় রাখা জরুরী।

আল্লাহ তা'আলা মানুষের অসাধ্য কোন হুকুম করেননি। যা কিছু আদেশ করেছেন বা নিষেধ করেছেন, সবই বান্দার আয়ত্তে ও ইখতিয়ারে।আল্লাহ তা'আলার ওপর কোন কিছু করা ওয়াজিব নয়। তিনি যা কিছু দান করেন, সবই তাঁর রহমত এবং মেহেরবানী মাত্র। তাঁর ওপর কারো কোনরূপ দাবি বা হুকুম কিংবা কর্তৃত্ব চলে না। ছোট হতে ছোট গুনাহের কারণে তিনি শাস্তি দিতে পারেন এবং বড় থেকে বড় পাপও তিনি মার্জনা করতে পারেন। সবই তাঁর ইচ্ছাধীন। তিনি কাউকে দোযখে দিলে, সেটাই ইনসাফ এবং কাউকে জান্নাতে প্রবেশ করালে, সেটা তার রহমত। আপত্তি করার অধিকার কারো নেই।

৭। মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত হওয়ার ওপর ঈমান

মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত হওয়ার ওপর ঈমান আনার অর্থ হচ্ছে, আমাদের বর্তমান জীবন পরীক্ষার নিমিত্ত। মৃত্যুর পর মহান আল্লাহ আমাদেরকে পুনরায় জীবিত করে এ জীবনের সকল বিষয়ের হিসাব নিবেন। মৃত্যুর পর একটি রয়েছে কবরে সাময়িক ফলভোগের বরযখী যিন্দেগী, আর পরবর্তীতে কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার পর আসবে পরকালীন আসল যিন্দেগী। পূর্ণাঙ্গ হিসাব-কিতাবের পর বান্দার জন্যে নির্ণীত হবে বেহেশত বা দোযখের সেই অনন্ত যিন্দেগী।

শান্তি ও আরামের ব্যবস্থা করা হয় এবং বদকারদের জন্যে আযাব শুরু হয়ে যায়।

কবর দ্বারা উদ্দেশ্য, আলমে বরযখ অর্থাৎ দুনিয়া ও আখিরাতের যিন্দেগীর মধ্যবর্তী যিন্দেগী। সকল মানুষ ইনতিকালের পর সেখানেই পৌঁছে যায়, তাই তাকে কবর দেয়া হোক বা না-ই হোক। যেমন-অনেককে বাঘ বা কোন হিংস্র প্রাণী খেয়ে ফেলে, কতেককে আগুনে জ্বালানো হয়, তারাও সেখানে উপস্থিত হয়। কবর বলে মূলত এ জগতকেই বোঝানো হয়। নেক লোকদের জন্যে কবর জান্নাত বা বেহেশতের একটা অংশ হয়ে যায়। তারা সেখানে আরামের সাথে অবস্থান করতে থাকে। মৃত ব্যক্তির জন্যে দু'আ করলে বা কিছু সদকা করলে, সে তা পেয়ে খুশি হয় এবং তাতে তার বড়ই উপকার হয়।

উল্লেখ্য, ঈমানে মুফাসসালের এ অংশটি ভিন্ন কোন বিষয় নয়, বরং ৫নং বিষয় অর্থাৎ কিয়ামতের ওপর ঈমান আনারই একটি স্তর; কিন্তু বিষয়টি জটিল ও সূক্ষ্ম হওয়ায় ভালভাবে বোঝানোর লক্ষ্যে আলাদা ধারার মাধ্যমে উল্লেখ করা হয়েছে।

এ হলো সহীহ ঈমানের সাতটি আরকান এবং তার কিছুটা ব্যাখ্যা ও তাফসীর। যে কোন ব্যক্তি এসব কথার সবগুলোকে মনে-প্রাণে বিশ্বাস করবে, মুখে স্বীকার করবে এবং এগুলোর দাবী অনুযায়ী আমলে সালিহা করবে, কুরআন ও সুন্নাহরদৃষ্টিতে তাকে বলা হবে পরিপূর্ণ মু'মিন ও মুসলিম। আল্লাহ তা'আলার ওয়াদা যে, তাকে দুনিয়াতে, বরযখে ও আখিরাতে ইজ্জত ও শান্তির সাথে রাখবেন এবং তাকে সকল প্রকার আযাব-গযব ও কষ্ট-পেরেশানি

থেকে হিফাযত করবেন। কিয়ামতের দিন দোযখ থেকে হিফাযত করে তাকে আল্লাহর পূর্ণ সন্তুষ্টির সংবাদসহ মহাসুখের আবাস ও আনন্দের জান্নাত দান করবেন।
আর যে ব্যক্তি উল্লেখিত কথাগুলোর সবগুলো মনে-প্রাণে বিশ্বাস তো করে, কিন্তু অলসতা বা গাফলতির কারণে কথাগুলোর দাবির ওপর আমল করে না বা আংশিকভাবে আমল করে, তাকে শরী'আতের দৃষ্টিতে ফাসিক বা গুনাহগার মু'মিন বলা হয়। তার গুনাহসমূহকে আল্লাহ তা'আলা ইচ্ছা করলে মাফ করতে পারেন, আর ইচ্ছা করলে তাকে আযাব ও দিতে পারেন। তবে সে ব্যক্তি তার ঈমানের বদৌলতে অবশ্যই জান্নাতে যাবে; সরাসরিও যেতে পারে, অথবা তার অপরাধের শাস্তি ভোগ করার পরে জান্নাতে যেতে পারে।

কিন্তু যে ব্যক্তি উক্ত বিষয়সমূহকে অবিশ্বাস করবে, অথবা এগুলো থেকে মাত্র কোন একটি বিষয়কে অবিশ্বাস করবে কিংবা তাতে সন্দেহ পোষণ করবে, অথবা তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য ও ঠাট্টা-বিদ্রূপ করবে, কিংবা এগুলোর মধ্যে কোন দোষ বের করবে, তার ঈমান থাকবে না। বরং সে কাফের বলে গণ্য হবে। আর যদি পূর্ব থেকে মুসলমান থেকে থাকে, তারপরে তার থেকে এ ধরনের অপরাধ প্রকাশ পায়, তাহলে তাকে মুরতাদ (দ্বীন ত্যাগকারী) বলা হবে, যদিও সে মুসলমান হওয়ার দাবি করে এবং যদিও সে পাঁচ ওয়াক্ত নামায জামা'আতের সাথে পড়ে, মাথায় টুপি ও মুখে দাড়ি রাখে রাখে বা হজ্ব-উমরা পালন করে। এসব আমল পরকালে তার কোন কাজে আসবে না। কারণ এ কাজগুলো নেক আমল। আর কেউ নেক আমল করলেই সে মু'মিন গণ্য হয় না। যেমন, নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর যামানায় অনেক মুনাফিক অর্থাৎ নিকৃষ্ট কাফির ছিল, তারা নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাথে সকল নেক কাজে অংশ গ্রহণ করতো। এমনকি জিহাদেও শরীক হতো। তারপরও তারা মু'মিন বলে গণ্য হয়নি।
বস্তুত ঈমান ভিন্ন জিনিস এবং আমল ভিন্ন জিনিস। সহীহ ঈমানের সাথে আমল দুনিয়া ও আখিরাতের ফায়দা পৌঁছায়। আর আমল ব্যতীত শুধু ঈমানও ফায়দা দেয় না। কারণ, এমন ঈমানদার, যার নিকট নেক আমল নেই, সেও কোন এক সময় জান্নাতে প্রবেশ করবে। কিন্তু ঈমান ব্যতীত শুধু নেক আমল দুনিয়াতে কিছু ফায়দা পৌঁছালেও যেমন, তার সুনাম হয় বা ব্যবসা বৃদ্ধি পায়, স্বাস্থ্য ভালো থাকে ইত্যাদি, কিন্তু আখিরাতে ঈমান ব্যতীত শুধু নেক আমল কোনই কাজে আসবে না।এ সকল বিষয় স্পষ্টভাবে জানা থাকা জরুরী। যাতে ফিতনা-ফাসাদের যুগে ঈমান রক্ষা করা সহজ হয়। হাদীস-শরীফে আছে, ফিতনার যামানায় অনেক মানুষ সকালে মু'মিন থাকবে বিকালে কাফির হয়ে যাবে।। সূত্র: তিরমিযী শরীফ খণ্ড-২, পৃষ্ঠা ৪৩, মুসলিম শরীফ খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৭৫।

অর্থাৎ লোকেরা ইলমে দ্বীন শিখবে না, হক্কানী উলামায়ে কিরামের সাথে সম্পর্ক রাখবে না: অপরদিকে বদদ্বীনীর সয়লাব ব্যাপকভাবে প্রবাহিত হবে। এমনকি দ্বীনের নামে কুফর ও শিরকের প্রচার করা হবে; তখন মানুষ না বুঝে কুফরকে দ্বীন মনে করে গ্রহণ করে কাফির হয়ে যাবে। [আল্লাহ তা'আলা সকলকে হিফাযত করুন।

এখন দেখতে হবে, এসব সহীহ আক্কীদা ও বিশ্বাস মুসলমানগণ কতটুকু ধরে রেখেছে এবং কতটুকুর মধ্যে পরিবর্তন সাধন করে সহীহ আক্কীদাকে বিগড়ে ফেলেছে। এ পর্যায়ে মুসলিম সমাজে প্রচলিত ভ্রান্ত আকীদাসমূহ বর্ণনার আশা রাখি। তবে তার পূর্বে ঈমানের বিবরণ আরো সবিস্তারে উপলব্ধির জন্যে ঈমানের ৭৭ শাখার বর্ণনা করা হচ্ছে।

ঈমান দুর্বল হয়ে যায় এবং ঈমানের নূর কমে যায় এমনকি কখনো কখনো ঈমান নষ্ট পর্যন্ত হয়ে যায় নিচে বর্ণিত কারণে।

১. কুফর দ্বারা

২. শিরক দ্বারা

৩. বিদ'আত দ্বারা

৪. কু-সংস্কার ও কু-প্রথা পালন করার দ্বারা।

৫. গুনাহ করার দ্বারা। (ইয়ানাতে আহকামে যিন্দেগী)

অধ্যায় দুই - ঈমানের সাতাত্তর শাখা

আল্লাহপাক ইরশাদ করেন-

وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هذه إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وهم يستبشرون

যখন কোন সূরা অবতীর্ণ হয়, তখন তাদের কেউ কেউ বলে, এ সূরা তোমাদের মধ্যে কার ঈমান কতটা বৃদ্ধি করলো? বস্তুত যারা ঈমানদার, এ সূরা তাদের ঈমান বৃদ্ধি করেছে এবং তারা আনন্দিত হয়েছে।। সূত্র: সূরা তাওবা, আয়াত ১২৪।।

অন্যত্র ইরশাদ হচ্ছে- وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إمانًا

যখন তাদের নিকট কুরআনের আয়াত তিলাওয়াত করা হয়, তখন তাদের ঈমান বেড়ে যায়।। সূত্র: সূরা আনফাল, আয়াত-২।।

উপরোক্ত আয়াতদ্বয় থেকে বোঝা যায়, কুরআনের আয়াত তিলাওয়াত, তা মর্মার্থ সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা এবং সে অনুযায়ী আমল করার ফলে ঈমানের উন্নতি অগ্রগতি ঘটে; অর্থাৎ ঈমানের নূর, আস্বাদ ও শক্তি বৃদ্ধি পায়।

হযরত আলী রাযি. বলেন: যখন ঈমান অন্তরে প্রবেশ করে, তখন একটি শ্বেত বিন্দুর মতো দেখায়। অতঃপর যতই ঈমানের উন্নতি হয়, সেই শ্বেত বিন্দু ততই সম্প্রসারিত হয়ে ওঠে। এমনকি শেষ পর্যন্ত গোটা অন্তর নূরে ভরপুর হয়ে যায়। সূত্র: তাফসীরে মাযহারী, খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ৩২৬. মা'আরিফুল কুরআন, খণ্ড ৪ পৃষ্ঠা ৪৯৪।।

হযরত আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহু সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, ঈমানের সত্তরের ওপর শাখা আছে। তন্মধ্যে সর্বোত্তম শাখা হলো, (দিলের বিশ্বাসের সাথে) লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু বলা এবং সর্বনিম্ন শাখা হলো, রাস্তা হতে কষ্টদায়ক জিনিস সরিয়ে দেয়া। আর লজ্জাশীলতা ঈমানের একটি অন্যতম শাখা।। সূত্র: মুসলিম শরীফ, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৪৭)

ঈমান ও ইসলাম কতগুলো কার্যের সমষ্টির নাম। সেই কার্যাবলীর মধ্যে কতগুলো দিলের দ্বারা সম্পন্ন হয়। কতগুলো জবান দ্বারা সম্পন্ন হয় এবং কতকগুলো শরীরের অন্যান্য অঙ্গ-প্রতঙ্গের দ্বারা সম্পন্ন হয়। মোট কার্য ৭৭টি। তন্মধ্যে দিলের দ্বারা সম্পন্ন হয় ৩০টি, জবানের দ্বারা সম্পন্ন হয় ৭টি এবং হাত-পা ইত্যাদি বাহ্যিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের দ্বারা সম্পন্ন হয় ৪০টি। বিস্তারিত নিম্নরূপ:

ঈমান সংশ্লিষ্ট ৩০টি কাজ-যা দিলের দ্বারা সমাধা হয়

১. আল্লাহ তা'আলার ওপর ঈমান আনয়ন করা

আল্লাহকে বিশ্বাস করা এবং আল্লাহর ওপর ঈমান আনয়নের অর্থ শুধু আল্লাহ তা'আলার অস্তিত্ব স্বীকার করা নয়, বরং অস্তিত্বের প্রতি বিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে তিনি যে অনাদি, অনন্ত, চিরঞ্জীব, নিরাকার, তা স্বীকার করা, তাঁর সিফাত অর্থাৎ মহৎ গুণাবলী স্বীকার করা এবং তিনি যে এক, অদ্বিতীয়, সর্বশক্তিমান ও দয়াময় এটাও স্বীকার করা এবং তিনি ব্যতীত অন্য কেউ ইবাদতের যোগ্য নয়-এ কথাও বিশ্বাস করা কর্তব্য।

২. সবই আল্লাহ তা'আলার সৃষ্ট-এর ওপর ঈমান রাখা

মুসলমানগণের অকাট্য বিশ্বাস ও ঈমান রাখতে হবে যে, ভালো-মন্দ ছোট-বড় সমস্ত বিষয় ও বস্তুনিচয়ের সৃষ্টিকর্তা একমাত্র আল্লাহ তা'আলা। সৃষ্টিকর্তা হিসেবে একমাত্র আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অন্য কেউ নেই।

৩. ফেরেশতা সম্বন্ধে ঈমান

ফেরেশতাগণ নিষ্পাপ, তাঁরা আল্লাহর প্রিয় ও ফরমাবরদার বান্দা। কোন কাজেই তাঁরা বিন্দুমাত্র নাফরমানী করেন না এবং তাঁদের আল্লাহপ্রদত্ত ক্ষমতাও অনেক বেশি। আল্লাহ তা'আলা তাদের ওপর অনেক যিম্মাদারী অর্পণ করেছেন।

৪. আল্লাহর কিতাব সম্বন্ধে ঈমান রাখা:

পবিত্র কুরআন সম্বন্ধে এরূপ ঈমান রাখতে হবে, এ মহান কিতাবটি কোন মানুষের রচিত নয়; বরং তা আদ্যোপান্ত আল্লাহ তা'আলার কালাম বা বাণী। পবিত্র কুরআন অক্ষরে অক্ষরে অকাট্য সত্য। এত ছাড়াও পূর্ববর্তী নবীগণের প্রতি সেসব ছোট-বড় কিতাব নাযিল হয়েছিল, সবই অক্ষরে অক্ষরে সত্য ও অকাট্য ছিল। অবশ্য পরবর্তীকালে লোকেরা ঐ সব বিকৃত ও পরিবর্তন করে ফেলেছে। কিন্তু কুরআন শরীফকে শেষ পর্যন্ত অপরিবর্তিত রূপে সংরক্ষণ করার ভার স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা নিয়েছেন। সেই হিসেবে পবিত্র কুরআন অবিকল নাযিলকৃত অবস্থায়ই বিদ্যমান রয়েছে। পবিত্র কুরআনকে কেউ বিকৃত করতে পারবে না।

৫. পয়গাম্বরগণ সম্বন্ধে ঈমান রাখা

বিশ্বাস রাখতে হবে, নবী বা পয়গাম্বর বহুসংখ্যক ছিলেন। তাঁরা সকলেই নিষ্পাপ ও বেগুনাহ ছিলেন। তাঁরা স্বীয় দায়িত্ব যথাযথ আদায় করে গেছেন। আমাদের নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম। তাঁর আনীত শরী'আতই আমাদের পালনীয়।

৬. আখিরাত সম্বন্ধে ঈমান রাখা

আখিরাতের উপর ঈমান রাখার অর্থ হলো, কবরের সওয়াল-জওয়াব ও সওয়াল-আযাব বিশ্বাস করা, হাশরের ময়দানে আদি হতে অন্ত পর্যন্ত পৃথিবীতে আগত সকল মানুষ একত্রিত হবে, নেকী-বদী পরিমাপ করা হবে ইত্যাদির প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা। অর্থাৎ কিয়ামত সম্বন্ধে যত কথা কুরআন ও হাদীস শরীফে এসেছে, সব বিশ্বাস করা জরুরী।

৭. তাকদীর সম্বন্ধে ঈমান রাখা

তাকদীর সম্বন্ধে কখনো তর্ক-বিতর্ক করবে না, বা মনে সংশয়-সন্দেহ স্থান দিবে না। দুনিয়াতে যা কিছু হয়েছে, হচ্ছে বা হবে, সবই মহান আল্লাহর একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রণাধীন ও হুকুমের তাবেদার। আল্লাহপাকের ক্ষমতায়ই সবকিছু হয়। অবশ্য আল্লাহ মানুষকে ইচ্ছা ও কাজের ইখতিয়ার দিয়েছেন। মানুষ নিজের ইখতিয়ার ও ইচ্ছায় ভালো-মন্দ যা কিছু করবে, আল্লাহ তার প্রতিদান দিবেন।

৮. বেহেশতের ওপর ঈমান রাখা

পবিত্র কুরআনের অসংখ্য আয়াতে বেহেশতের কথা উল্লেখ আছে। আল্লাহপাক নেককার মু'মিন বান্দাদেরকে বেহেশতে তাদের আমলের যথার্থ প্রতিদান ও পুরস্কার দিবেন। তারা ঈমান ও নেক আমলের বদৌলতে চিরকাল বেহেশতের অফুরন্ত নেয়ামত ও শান্তি ভোগ করবেন। বেহেশতের বাস্তবতা সম্পর্কে দৃঢ় ঈমান রাখতে হবে।

৯. দোযখের ওপর ঈমান রাখা

পবিত্র কুরআনের বহু আয়াতে দোযখের উল্লেখ রয়েছে। আল্লাহপাক কাফির, ফাসিক-ফাজির ও বদকারদেরকে জাহান্নাম বা দোযখে তাদের কৃতকর্মের উপযুক্ত পরিণাম বা শাস্তি দিবেন। কাফিররা চিরকাল জাহান্নামে থাকবে। আর গুনাহগার ঈমানদাররা জাহান্নামে নির্দিষ্ট মেয়াদের শাস্তি ভোগের পর ঈমানের বদৌলতে জান্নাতে যাবে। দোযখের বাস্তবতার ওপর ঈমান রাখতে হবে।

১০. অন্তরে আল্লাহর মুহাব্বত রাখা

অন্তরে মহান আল্লাহর প্রতি সর্বদা মুহাব্বত বদ্ধমূল রাখতে হবে। এমনকি দুনিয়ার সবকিছু থেকে আল্লাহপাকের মুহাব্বত বেশি হতে হবে। মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআন মজীদে ইরশাদ করেন- وَالَّذِيْنَا مِنُوا اشد حبا لله

যারা মু'মিন, আল্লাহর প্রতি তাদের মুহাব্বত সর্বাধিক প্রকট।

১১. আল্লাহর ওয়াস্তে কারো সাথে দোস্তি ও দুশমনি রাখা

হযরত রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: যার মধ্যে তিনটি গুণ থাকবে, সে ঈমানের মধুরতা, প্রকৃত স্বাদ অনুভব করতে পারবে-

ক. যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে সর্বাধিক মুহাব্বত করবে।

খ. কোন ব্যক্তি বা বস্তুর সাথে মুহাব্বত করতে হলে আল্লাহর উদ্দেশ্যেই করবে। অন্য কোন উদ্দেশ্য করবে না।

গ. কোন ব্যক্তি বা বস্তুকে মন্দ জানতে হলে, শুধুমাত্র আল্লাহর ওয়াস্তেই মন্দ জানবে।। সূত্র: মুসনাদে আহমাদ। খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-১০৩, ১৭৪, ২৩০, ২৪৮, ২৮৮।।

১২. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি মুহাব্বত রাখা, সুন্নাতকে ভালোবাসা

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর প্রতি মুহাব্বত রাখা ঈমানের বিশেষ শাখা। এর অর্থ শুধু মুহাব্বতের দাবি করা বা নাত-গযল পড়া নয়, বরং এর সংশ্লিষ্ট কর্তব্য পালন করতে হবে। যথা-

১. অন্তরের দ্বারা রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ভক্তি করতে হবে।
২. বাহ্যিকভাবে তাঁর আদব-তাযীম রক্ষা করতে হবে।
৩. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ওপর দুরূদ ও সালাম পড়তে হবে।
৪. রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাত তরীকার পায়রবি করতে হবে।

১৩. ইখলাসের সাথে আমল করা

যে কোন নেক কাজ খালিসভাবে আল্লাহকে রাজি-খুশি করার নিয়তে করা ঈমানের দাবি। নিয়ত খালিস হবে, মুনাফিকী ও রিয়া থাকতে পারবে না। মু'মিনের সকল কাজ একমাত্র আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্যেই হতে হবে।

১৪. গুনাহ থেকে তাওবা করা

তাওবা শুধু গদ-বাধা কতগুলো শব্দ উচ্চারণের নাম নয়; বরং গুনাহের কারণে অনুতপ্ত হয়ে ক্ষমা চেয়ে তা থেকে সম্পূর্ণরূপে পরহেয করা জরুরী। এক বুযুর্গ আরবীতে অতি সংক্ষেপে তাওবার ব্যাখ্যা এভাবে করেছেন التوبة تحرق الحشا

على الخطأ গুনাহের কারণে মনের ভিতর অনুতাপের আগুন জ্বলাকেই তাওবা বলে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি. বলেন-রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন: الندم توبة অনুতাপের নামই তাওবা। (সূত্র:মুসানাদে আহমাদ খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-৩৭৬, ৪২৩, ৪৩৩।।

১৫. অন্তরে আল্লাহর ভয় রাখা

হযরত মু'আয রাযি. হতে রিওয়ায়েত আছে যে, ঈমানওয়ালার দিল কখনো খোদার ভয় ছাড়া থাকে না, সবসময়ই তা আল্লাহর ভয়ে কম্পমান থাকে। কোন সময়ই নিশ্চিন্ত হয়ে বসে থাকতে পারে না। (সূত্র: হিলইয়াতুল আউলিয়া।।

১৬. আল্লাহপাকের রহমতের আশা করা

কুরআন শরীফে আছে, যারা কাফির, তারাই শুধু আল্লাহপাকের রহমত হতে নিরাশ হয়। আল্লাহর রহমতের আশা রাখা ঈমানের একটি বিশেষ শাখা।

১৭. লজ্জাশীলতা বজায় রাখা

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন- الحياء شعبة الايمان লজ্জাশীলতা ঈমানের একটি বড় শাখা। (সূত্র: বুখারী খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-৬ ও মুসলিম খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-৪৭।।

১৮. শুকরগুযার হওয়া

শুকর দুই প্রকার। ক. আল্লাহর শুকর আদায় করা, যিনি প্রকৃত দাতা। আল্লাহ তা'আলা বলেন, আমার শুকর করো, নাশুকরি করো না।

খ. মানুষের শুকর আদায় করা। অর্থাৎ যাদের হাতের মাধ্যম আল্লাহপাকের নেয়ামত পাওয়া যায়, তাদের শুকর করা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, যে ব্যক্তি মানুষের শুকর আদায় করলো না, সে আল্লাহর শুকর করলো না।

১৯. অঙ্গীকার রক্ষা করা

আল্লাহ তা'আলা বলেছেন

-يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

হে ঈমানদারগণ! অঙ্গীকার পূর্ণ করো। অর্থাৎ কাউকে কোন কথা দিয়ে থাকলে তা রক্ষা করো।। সূত্র: সূরা মায়িদা ১।

২০. সবর বা ধৈর্য ধারণ করা

আল্লাহ তা'আলা বলেন, যারা সবর করে, আল্লাহ তা'আলা (সহায়) আছেন।

41/148

২১. তাওয়াযু বা নম্রতা অবলম্বন করা

নম্রতা অর্থ নিজেকে নিজে অন্তর থেকে সকলের তুলনায় ছোট মনে করা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর উদ্দেশ্যে নম্রতা অবলম্বন করে, আল্লাহ তা'আলা তার মর্যাদা বাড়িয়ে দেন।। সূত্র: হিলয়াতুল আউলিয়া খণ্ড-৭, পৃষ্ঠা-১২৯, মিশকাত-৪৩৪।।

২২. দয়ার্দ্র ও স্নেহশীল হওয়া

হযরত আবু হুরাইরা রাযি. রিওয়ায়েত করেন, নবীজী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি দুর্ভাগা, তার থেকেই দয়া ছিনিয়ে নেয়া হয়।। সূত্র: মুসনাদে আহমাদ খণ্ড-২, পৃষ্ঠা ৩০১ ও তিরমিযী শরীফ খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-১৪।।

২৩. তাকদীরে সন্তুষ্ট থাকা

তাকদীরে সন্তুষ্ট থাকাকে 'রিয়া বিল কাযা' বলে, মহান আল্লাহর সকল ফয়সালা সন্তুষ্ট চিত্তে গ্রহণ করা। আল্লাহর হুকুমে বিপদ-আপদ বা দুঃখ-কষ্ট আসলে অসন্তুষ্ট না হওয়ার অর্থ এই

নয় যে, মনে কষ্ট লাগতে দিবে না, পেরেশানও হবে না। কেননা, কষ্টের বিষয়ে কষ্ট লাগাই তো স্বাভাবিক। তবে আসল কথা হচ্ছে, কষ্ট লাগলেও বুদ্ধির দ্বারা ও জ্ঞানের দ্বারা তার মধ্যে কল্যাণ আছে এবং এটা আল্লাহপাকেরই হুকুমে হয়েছে মনে করে সেটাকে পছন্দ করবে। কষ্টকে মনে স্থান দিবে না।

২৪. তাওয়াক্কুল অবলম্বন করা

আল্লাহ তা'আলা বলেছেন-

و على الله فليتوكل المؤمنون

যাদের ঈমান আছে, তাদের শুধু আল্লাহ তা'আলারই ওপর তাওয়াক্কুল (ভরসা) করা উচিত।

২৫. অহংকার না করা

অহংকার না করা অর্থাৎ অন্যের তুলনায় নিজেকে নিজে ভালো এবং বড় মনে না করা ঈমানের অঙ্গ। তাবারানী নামক হাদীসের কিতাবে একটি হাদীস বর্ণিত আছে- তিনটি জিনিস মানুষের জন্যে সর্বনাশকারী-

ক. লোভ-যে লোভকে না সামলিয়ে বরং মানুষ তার অনুগত হয়।

খ. নফসানী খায়েশ-যে নফসানী খায়েশকে দমন না করে বরং তার চাহিদা অনুযায়ী কাজ করা হয়।

গ. অহংকার-তাকাব্বুর বা অন্যের তুলনায় নিজেকে ভালো ও বড় মন করে।। সূত্র : তাবারানী আউসাত: খণ্ড ৫, পৃষ্ঠা-৪৮৬, হিলয়া: খণ্ড ৩,-পৃষ্ঠা-২১৯।।

২৬. চোগলখুরী, কীনা ও মনোমালিন্য বর্জন করা

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, চোগলখুরী ও কীনা মানুষকে দোযখে নিয়ে ফেলে। অতএব, কোন মু'মিনের দিলেই এ গর্হিত খাসলত থাকা উচিত নয়।। সূত্র: তারারানী, আউসাত খণ্ড ৫, পৃষ্ঠা ১২৫ হাদীস (৪৬৫৩)।

২৭. হাসাদ বা হিংসা-বিদ্বেষ বর্জন করা

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, অগ্নি যেমন কাঠকে ভস্ম করে ফেলে, তদ্রূপ হিংসা মানুষের নেকীকে ভস্ম করে ফেলে। অতএব খবরদার! খবরদার! তোমরা কখনো হিংসা-বিদ্বেষ করবে না।। সূত্র: ইবনে মাজাহ পৃষ্ঠা-৩১০।

২৮. ক্রোধ দমন করা

আল্লাহ তা'আলা কুরআন শরীফে ক্রোধ দমনকারীদের প্রশংসা করেছেন। অনর্থক রাগ করা গুনাহ। রাগ-ক্রোধ দমনে হাদীসে তাকীদ এসেছে। তবে ইসলামের বিরুদ্ধে কোন আয়াত আসলে, সেখানে ক্রোধ ও অসন্তুষ্টি প্রদর্শনই ঈমানের দাবি।

২৯. অন্যের অনিষ্ট সাধন ও প্রতারণা না করা

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে অন্যের ক্ষতি করে অর্থাৎ পরের মন্দ চায়, অপরকে ঠকায়, ধোঁকা দেয়, তার সাথে কোন সংশ্রবই নেই।। সূত্র: মুসলিম শরীফ, খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-৭০।

৩০. দুনিয়ার অত্যধিক মায়া-মুহাব্বত ত্যাগ করা

হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন যে দুনিয়াকে ভালবাসবে, তার আখিরাতের লোকসান হবে এবং যে আখিরাতকে ভালবাসবে, তার দুনিয়ার কিছু ক্ষতি হবে। হে আমার উম্মতগণ! তোমাদের মঙ্গলের জন্যে আমি তোমাদেরকে বলছি, তোমরা অস্থায়ী ও ক্ষণস্থায়ী দুনিয়াকে ভালোবেসে চিরস্থায়ী আখিরাতকে নষ্ট করে দিও না। তোমরা সকলেই চিরস্থায়ী পরকালকেই শক্তভাবে ধর এবং বেশি করে ভালবাসো। অর্থাৎ দুনিয়ার মুহাব্বত পরিত্যাগ করে আখিরাতের প্রস্তুতিতে আমলের প্রতি যথাযথ ধাবিত হও।। সূত্র: মুসনাদে আহমদ খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা-৪১২ ও বাইহাকী, খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-৩৭০।।

ঈমান সংশ্লিষ্ট সাতটি কাজ-যা জবানের দ্বারা সমাধা হয়

৩১. কালিমা পড়া

কালিমার অর্থ-আল্লাহ তা'আলার সঙ্গে বান্দার অঙ্গীকারের কথা দিলে বিশ্বাস করার সাথে সাথে মুখে স্বীকার করা। ইমাম আহমদ রহ. একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন-রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, তোমরা ঈমান তাজা করতে থাকবে। আরয করা হলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! ঈমান তাজা করতে হবে কেমন করে? হুযুর সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করলেন, খুব বেশি করে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু কালিমা পড়তে থাকবে।। সূত্র: আহমদ, খণ্ড-২, পৃষ্ঠা -৩৫৯।।

হযরত আবু সাঈদ খুদরী ও হযরত আবু হুরাইরা রাযি. হতে রিওয়ায়েত আছে হুযুর সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, মৃত্যুর দ্বারপ্রান্তে উপনীত (মুমূর্ষ) লোকদেরকে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু কালিমার তালকীন দাও।। সূত্র: মুসলিম শরীফ, খণ্ড-১, পৃষ্ঠা ৩০০।

অন্তরে আল্লাহ আল্লাহ ও রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি ঈমানের পাশাপাশি মুখে তার প্রকাশই রয়েছে কালিমার ভিতর।

৩২. কুরআন মাজীদ তিলাওয়াত করা

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, কুরআন শরীফ তিলাওয়াত করতে থাক। কেননা, যারা কুরআন শরীফ তিলাওয়াত করতে থাকবে, কিয়ামতের দিন স্বয়ং কুরআন শরীফ তাদের জন্য শাফা'আত করবে। (সূত্র: মুসলিম শরীফ, খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-২৭০।।

৩৩. দ্বীনি ইলম শিক্ষা করা

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা যার ভালো করার ইচ্ছা করেন, তাকে দ্বীনের ইলম ও কুরআনী জ্ঞান দান করেন। (সূত্র:বুখারী, খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-১৬ ও মুসলিম শরীফ, খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-৩৩৩। তিনি আরো বলেছেন, ইলম শিক্ষা করা প্রত্যেক মুসলমানের ওপর ফরয।। সূত্র: ইবনে মাজাহ, পৃষ্ঠা-২০।

আরবী ভাষায় ব্যুৎপত্তি না থাকার কারণে এবং উসতাদের কাছে হাদীস না পড়ার দরুন অনেকে এই হাদীসের দ্বারা আধুনিক বিদ্যার নামে ভাষা শিক্ষা এবং জ্ঞানের নামে জড়জগতের জ্ঞান লাভের অর্থ বুঝে এবং বুঝিয়ে থাকে। এটা সম্পূর্ণ ভুল ও মনগড়া ব্যাখ্যা। এখানে ইলম দ্বারা একমাত্র দ্বীনের জ্ঞানই উদ্দেশ্য।

৩৪. দ্বীনি ইলম শিক্ষা দেওয়া

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, কারো নিকট কোন ইলমের কথা জিজ্ঞেস করা হলে অর্থাৎ শিক্ষাপ্রার্থী হলে, সে জানা সত্ত্বেও যদি তা প্রকাশ না করে অর্থাৎ শিক্ষা না দেয়, তবে কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা তাকে আগুনের লাগাম পরিয়ে (শাস্তি) দিবেন।। সূত্র: আবু দাউদ খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৫১৫ ও

তিরমিযী শরীফ, খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৯৩। অন্য হাদীসে এসেছে, দ্বীন শিক্ষা দানকারীর জন্য আসমান ও জমিনের সকল মাখলুক দু'আ করতে থাকে।। সূত্র: তিরমিযী শরীফ, খণ্ড-২, পৃষ্ঠা ৯৭ ও মিশকাত শরীফ, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৩৪।।

তাই আল্লাহপাক যাকে দ্বীনি ইলম দান করে সৌভাগ্যমন্ডিত করেছেন, তার কর্তব্য হচ্ছে, অন্যকে সেই ইলম শিখানো।

৩৫. আল্লাহর নিকট দু'আ বা প্রার্থনা করা

হযরত আনাস রাখি, রিওয়ায়েত করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, দু'আ ইবাদতের মগজ।। সূত্র: তিরমিযী শরীফ, খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-১৭৫।।

রাসূলুল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো বলেন, আল্লাহর নিকট দু'আ চাওয়ার মতো মূল্যবান জিনিস আর নেই। অর্থাৎ বান্দা যদি আল্লাহ তা'আলার কাছে কিছু চায়, তবে আল্লাহ তা'আলা বড়ই সন্তুষ্ট হন। (সূত্র: তিরমিযী শরীফ, খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-১৭৫।।

তাই আল্লাহপাকের কাছে দু'আ করতে হবে। হাজত চাইতে হবে।

৩৬. আল্লাহর যিকির করা

হযরত আবু মূসা আশআরী রাযি. রিওয়ায়েত করেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, যে আল্লাহর যিকির করে, সে জীবিতের ন্যায় এবং যে, যিকির করে না, সে মৃত্যু-তুল্য।। সূত্র: বুখারী খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৯৪৮ ও মুসলিম শরীফ, খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-২৬৫।।

রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, বিভিন্ন জিনিসের ময়লা দূর করার জন্য বিভিন্ন ব্যবস্থা ও যন্ত্র আছে; দিলের মলিনতা দূর করার ব্যবস্থাপনা হচ্ছে আল্লাহর যিকির। (সূত্র: বাইহাকীম শু'আবুল ঈমান খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-৩৯৬।।

৩৭. বেহুদা কথা হতে জবানকে রক্ষা করা

হযরত সাহল বিন সা'দ রাযি. বর্ণনা করেন, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি
ওয়া সাল্লাম বলেন, আমার জন্য যে ব্যক্তি দু'টি জিনিসের যিম্মাদার বা জামিন হবে-এক যা তার ওষ্ঠদ্বয়ের মাঝে আছে অর্থাৎ জিহ্বা, দুই যা তার উরুদ্বয়ের মাঝে আছে অর্থাৎ লজ্জাস্থান, আমি তার জন্যে বেহেশতের যামিন ও যিম্মাদার হবো।। সূত্র: বুখারী শরীফ খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৯৫৮-৯৫৯।।

ঈমান সংশ্লিষ্ট ৪০ টি কাজ যা বাহ্যিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের দ্বারা সমাধা হয় বাহ্যিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের দ্বারা ঈমানের মোট ৪০টি কার্য সমাধা হয়। তন্মধ্যে ১৬টি কাজ নিজেই করতে হয়। ৬টি নিজের লোকদের সঙ্গে করতে হয়। এবং ১৮টি অন্যান্য জনসাধারণের সাথে করতে হয়। বিস্তারিত নিম্নরূপ:

ঈমান সংশ্লিষ্ট ১৬ টি কাজ যা- নিজে নিজেই করতে হয়

৩৮. পাক-সাফ ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা

হযরত রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, তাহারাত (পাক-সাফ থাকা) ঈমানের অর্ধেক। (সূত্র: মুসলিম, শরীফ, খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-১১৮।।

৩৯. নামায কায়িম করা

হযরত রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, তোমাদের ছেলেমেয়েদের বয়স যখন সাত বছর হয়, তখন তাদেরকে নামায পড়ার জন্যে আদেশ করো। দশ বছর হলে যদি তারা নামায না পড়ে, তাহলে তাদেরকে হাতের দ্বারা শাস্তি দিয়ে নামায পড়াও। আর তাদের শয়নের বিছানা পৃথক করে দাও, অর্থাৎ যখন তাদের কিছু জ্ঞান-বুদ্ধি হয়, তখন তাদের পৃথক বিছানায় শুতে দাও।। সূত্র: আবু দাউদ শরীফ, খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-৭০।। নামায পড়ায় প্রভূত ফযীলত ও সওয়াব এবং নামায তরক করায় কঠিন শাস্তি ও আযাব সম্বন্ধে কুরআনের বহু আয়াত এবং প্রচুর হাদীসের বর্ণনা এসেছে।

৪০। যাকাত দেয়া

হযরত আবু হুরাইরা রাযি. রিওয়ায়েত করেন, হযরত রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, আল্লাহ তা'আলা যাদেরকে মাল দান করেছেন, তারা যদি যাকাত না দেয়, তাহলে কিয়ামতের দিন সেই মালের দ্বারা বিষাক্ত সাপ বানানো হবে এবং সে সাপ তাদের গলায় পেঁচিয়ে দেয়া হবে।। সূত্র : বুখারী শরীফ, খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-১৮৮।।

৪১। রোযা রাখা

রোযার ফযীলত সম্বন্ধে এবং রোযা ছাড়লে যে কত বড় গুনাহ হয়, সে বিষয়ে অনেক হাদীস বর্ণিত আছে। এক হাদীসে হযরত রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ, ইচ্ছা পূর্বক রমযানের কোন একটি রোযা ছেড়ে দিলে সারা জীবন রোযা রেখেও তার ক্ষতিপূরণ সম্ভব নয়। । সূত্র: বুখারী শরীফ, খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-২৫৯।।

৪২. হজ্ব করা (উমরা পৃথক আমল হলেও তা হজেরই একটি পর্যায়)

হযরত আবু উমামা রাযি. হতে রিওয়ায়েত আছে, হযরত রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, গরিব হওয়া, বাদশাহর জুলুমগ্রস্ত হওয়া কিংবা রোগাক্রান্ত হওয়া (এই তিন কারণে হজ্ব না করতে পারলে, তাতে গুনাহ হবে না); এই তিন প্রকার বাধা-বিঘ্নের কোন একটি না থাকা স্বত্বেও যে ব্যক্তি হজ্ব না করবে, তার ইচ্ছা, চাই সে ইহুদী হয়ে মারা যাক অথবা নাসারা হয়ে মারা যাক। অর্থাৎ মুসলমান হিসেবে তার মৃত্যু শংকামুক্ত নয়।। সূত্র: সুনানে দারিমী, খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৪৫।

অবশ্য রোগাক্রান্ত ধনী ব্যক্তির হজ্ব মাফ হবে না। রোগমুক্তির সম্ভাবনা না থাকলে তার ওপর হজ্ব বদল করানো জরুরী।

৪৩. ইতিফাক করা

হযরত আয়িশা সিদ্দীকা রাযি. রিওয়ায়েত করেন, হযরত রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে আল্লাহ তা'আলা যাবৎ না ওফাত দিয়েছেন, সে যাবৎ তিনি সর্বদা রমযান শরীফের শেষ দশ দিন ই'তিকাফ করতেন এবং তাঁর ইনতিকালের পর সম্মানিতা বিবিগণ ই'তিকাফ করেছেন। (সূত্র: বুখারী শরীফ, খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-২৭১ ও মুসলিম শরীফ, খণ্ড-১ পৃষ্ঠা-৩৭১।।

৪৪. হিজরত করা

ঈমান বাঁচানোর জন্য স্বজন ও স্বদেশ ত্যাগ করে অন্যত্র নিরাপদ আশ্রয় গ্রহণকে 'হিজরত' বলে। হযরত রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, হিজরতের কারণে পূর্ববর্তী সমস্ত গুনাহ মাফ হয়ে যায়।।সূত্র: মুসলিম শরীফ, খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-৭৬।

৪৫. নযর (মান্নত) পুরা করা

হযরত রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর ফরমাবরদারি করার নযর (মান্নত) মানবে, তার সে নযর-মান্নত পুরা করতে হবে; কিন্তু যদি কেউ আল্লাহর নাফরমানী করার মান্নত মানে, তাহলে সেই মান্নত পুরা করা যাবে না। এ ধরণের মান্নত করা গুনাহ।।সূত্র: বুখারী শরীফ, খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৯৯১।

৪৬. কসম রক্ষা করা

পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে-

واحفظوا أيمانكم

কসম খেলে তা রক্ষা করো। অর্থাৎ কসম খেলে তা ঠিক রাখা অথবা কসম ভঙ্গ হলে, তার কাফফারা দেয়া কর্তব্য।। সূত্র: সূরা মায়িদা, আয়ত-৮৯।।

৪৭. কাফফারা আদায় করা

কাফফারা চার প্রকার। যথা-ক, কসমের কাফফারা, খ. ভুলবশত খুনের কাফফারা, গ. স্ত্রীর সাথে যিহার করার কাফফারা ও ঘ. রমযানের রোযার কাফফারা। এ সকল ব্যাপারে কাফফারা ওয়াজিব হয়ে গেলে তৎক্ষণাৎ কাফফারা আদায় করা ঈমানের দাবি।

৪৮. সতর ঢাকা

হযরত রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, আল্লাহপাকের ওপর এবং কিয়ামত দিনের ওপর যে ঈমান রাখে, সে যেন কাপড় পরে হাম্মামে (গোসলখানায়) যায়, অর্থাৎ মানুষদের সম্মুখ দিয়ে সতর খুলে না যায়।। সূত্র: তিরমিযী শরীফ, খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-১০৭।।

৪৯. কুরবানী করা

হযরত যায়িদ ইবনে আরকাম রাযি, হতে রিওয়ায়েত আছে, একদা সাহাবায়ে কিরাম রাযি. হযরত রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর খিদমতে আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহু! এই কুরবানী কী জিনিস? হযরত রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, এটা তোমাদের পিতা হযরত ইবরাহীম আ. এর তরীকা। সাহাবীগণ আরয করলেন, হুযূর! আমরা এর প্রতিদানে কী পাব? হযরত রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, প্রত্যেকটি পশমের পরিবর্তে এক একটি নেকী পাবে। (সূত্র: ইবনে মাজাহ, পৃষ্ঠা-২২৬।।

কুরবানীর ফযীলত সম্বন্ধে আরো অনেক হাদীস রয়েছে।

৫০. মৃত ব্যক্তির কাফন-দাফন করা

হযরত জাবির রাযি. রিওয়ায়েত করেন, হযরত রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, যখন তোমরা তোমাদের কোন মুসলমান ভাইকে কাফন দাও, তখন ভালোভাবে কাফন দিবে।। সূত্র: মুসলিম শরীফ, খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-৩০৬]

৫১. ঋণ শোধ করা

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি. রিওয়ায়েত করেন, হযরত রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, আল্লাহর রাস্তায় শহীদ হতে পারলে, সব গুনাহ মাফ হয়ে যায়, কিন্তু পরের ঋণ অর্থাৎ বান্দার যে কোন প্রকার হক মাফ হয় না।। সূত্র: মুসলিম শরীফ, খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-১৩৫।।

সুতরাং, খুব বেশি জরুরী দরকার ও একান্ত অপারগতা ব্যতীত ঋণ গ্রহণ করাই অনুচিত। তারপরেও ঠেকায় পড়ে ঋণ করলে ব্যবস্থা হওয়ার সাথে সাথেই তা পরিশোধ করে দেয়া ঈমানের দাবি। যাতে করে করজদাতাকে কষ্টে না ফেলা হয়।

মুসলমান ভাইগণ! পরের কাছে ঋণগ্রস্ত থাকা বড় মারাত্মক কথা। চিন্তা করে দেখুন, শহীদের মর্তবা হতে বড় মর্তবা আর কার হতে পারে? অথচ সকল প্রকার গুনাহ মাফ হলেও বান্দার হক মাফ হবে না।

৫২. ব্যবসা-বাণিজ্যে সততা বজায় রাখা

হযরত রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, সত্যবাদী খাঁটি বিশ্বস্ত কারবারী-ব্যবসায়ী হাশরের ময়দানে নবীগণ, সিদ্দীকগণ ও শহীদগণের সঙ্গী হবে।। সূত্র: তিরমিযী শরীফ, খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-২৩০।।

৫৩. সত্য সাক্ষ্য দেয়া

ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه أثم قلبه-

সাক্ষ্য গোপন করো না। অর্থাৎ সত্য ঘটনা জেনে তা লুকিয়ে রেখো না। যে তা লুকিয়ে রাখবে, তার আত্মা পাপিষ্ঠ। (সূত্র: সূরা বাকারা, আয়াত-২৮৩।।

সত্য ঘটনা জেনেও প্রয়োজনের সময় সাক্ষ্য না দিয়ে গোপন করা দুরুস্ত নয়।

ঈমান সংশ্লিষ্ট ৬টি কাজ- যা আপনজনের সাথে সম্পৃক্ত

৫৪. বিবাহের দ্বারা চরিত্র রক্ষা করা

হযরত রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, হে যুবসমাজ! তোমাদের মধ্যে যে স্ত্রীর ভরণ-পোষণের বন্দোবস্ত করতে পারে, তার বিবাহ করা উচিত। কেননা, বিবাহ করলে চক্ষুর হেফাযত হয় এবং কামরিপুও দমন হয়। (সূত্র:বুখারী খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৭৫৮ ও মুসলিম শরীফ, খণ্ড-১, পৃষ্ঠা৪৪৯।।

৫৫. পরিবারবর্গের হক আদায়

হযরত রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, নিজের পরিবার পরিজনের জরুরত পূর্ণ করার জন্যে খরচ করাই মালের সর্বোৎকৃষ্ট সদ্ব্যবহার।। সূত্র: মুসলিম শরীফ।।নিজের পিতা-মাতা, ছেলেমেয়ে, স্ত্রী ও চাকর-নওকর, গোলাম-বাদী ইত্যাদিও পরিবারভুক্ত। পরিবার-পরিজনের হক শুধু তাদের খাওয়ানো পরানো আর স্বাস্থ্যবান করে

গড়ে তোলার নাম নয়, বরং তাদের কুরআন হাদীস ও দ্বীনি বিষয়ে শিক্ষাদান করা, চরিত্রবান করতে চেষ্টা করা, কুকর্ম, কুসংসর্গ, কুশিক্ষা হতে বাঁচিয়ে রাখা এবং তাদের সাথে নরম ব্যবহার করাও তাদের হক (প্রাপ্য)। এ হক আদায় করা ঈমানের শাখা।

৫৬. পিতা-মাতার খেদমত করা

হযরত রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, পিতা-মাতার খুশিতে আল্লাহর খুশি এবং পিতা-মাতার অসন্তুটিতে আল্লাহর অসন্তুষ্টি নিহিত।। সূত্র: তিরমিযী শরীফ, খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৯।।

অন্য হাদীসে আছে, সন্তান পিতা-মাতার চেহারার দিকে মুহাব্বতের নজরে একবার তাকালে তার আমলনামায় একটি কবুল হজ্বের সওয়াব লেখা হয়।

৫৭. সন্তান লালন-পালন করা

সন্তানদেরকে দ্বীনি ইলম ও আদব-কায়দা শিক্ষা দেওয়াও লালন-পালনভুক্ত একটি দায়িত্ব। হযরত রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তির তিনটি মেয়ে হবে, আর সে তাদেরকে যত্নের সাথে ইসলামী আদব-আখলাক দিবে এবং তাদেরকে স্নেহের সাথে লালন-পালন করবে, সে নিশ্চয়ই বেহেশতে প্রবেশ করবে।। সূত্র: আল-আদাবুল মুফরাদ লিল বুখারী, পৃষ্ঠা-৩৭।।

৫৮. আত্মীয়তা রক্ষা করা

হযরত রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, যে আত্মীয়বর্গের সাথে অসদ্ব্যবহার করবে, সে বেহেশতে যেতে পারবে না।। সূত্র: বুখারী খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৮৮৫ ও মুসলিম, খণ্ড,-২, পৃষ্ঠা-৩১৫।।

আত্মীয় বলতে মাতা-পিতা, ভাই-বোন, চাচা-ফুফু, ভাতিজা-ভাতিজী, ভাগিনা-ভাগিনী, মামা-খালা, নানা-নানী, দাদা-দাদী ইত্যাদি সবাই অন্তর্ভুক্ত।

৫৯. মনিবের ফরমাবরদার হওয়া

হযরত রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, গোলাম যদি মনিবের অনুগত থেকে আল্লাহর ইবাদত করে তাকে দ্বিগুণ সওয়াব দেওয়া হবে।। সূত্র: বুখারী খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৩৪৬।।

ঈমান সংশ্লিষ্ট ১৮টি কাজ-যা অন্য লোকদের সাথে সম্পৃক্ত

৬০. ন্যায়বিচার করা

হযরত রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, সাত প্রকার লোককে আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিনে আরশের ছায়ায় স্থান দান করবেন, তন্মধ্যে ন্যায়বিচারক একজন।। সূত্র: বুখারী, খণ্ড-পৃষ্ঠা-৯০।

৬১. জামাআতের সাথে ঐক্যবদ্ধ থাকা ও জিহাদ করা

হযরত রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, আল্লাহ তা'আলা আমাকে যে পাঁচটি কাজের হুকুম করেছেন, তোমাদের আমি সে পাঁচটি কাজের হুকুম করছি। ক. ইমামের। ইসলামের রাষ্ট্রপ্রধানের। আদেশ শ্রবণ করা, খ. সে আদেশ খুশির সাথে পালন করা, গ. দ্বীন প্রচার করা এবং দ্বীন প্রচারার্থে জিহাদ করা, ঘ. দ্বীন-ঈমান রক্ষার্থে হিজরত করা বা স্বজন ও স্বদেশ ত্যাগ করা ও ৬. খাঁটি মুসলমানদের জামাতের সাথে একতাবদ্ধ হয়ে থাকা অর্থাৎ তাদের আক্বীদা থেকে সামান্যতম ভিন্ন আক্বীদা পোষণ না করা। যে জামাআত ছেড়ে অর্থ হাত পরিমাণও দুরে সরে পড়েছে, অর্থাৎ নতুন কোন আক্বীদা গ্রহণ করেছে সে ইসলামের রজ্জুকে গর্দান হতে ফেলে দিয়েছে। ।সূত্র: তিরমিযী শরীফ, খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-১১৩-১১৪, ও মুসনাদে আহমাদ, খণ্ড-৫ পৃষ্ঠা-৩৩৪।।

জামাতের সাথে থাকার অর্থ এই যে, আক্বায়িদ-আমলের বিষয়ে আহলে হকের পায়রবি করবে। যে সকল হক্কানী আলিম-উলামা ও দ্বীনদার মুসলমান কুরআন ও সুন্নাহ মতে চলেন, তারাই আহলে হক।

৬২. রাষ্ট্র প্রধানের আনুগত্য করা

হযরত রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, আমি তোমাদের অসিয়ত করছি, আল্লাহ তা'আলার ভয় সবসময় দিলে জাগরূক রেখো এবং ইসলামী রাষ্ট্রপ্রধান ও খলীফা একজন হাবশী গোলাম হলেও তার আদেশ শ্রবণ করে তা পালন করো।। সূত্র: তিরমিযী শরীফ খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-৩০০।।

ইসলামী রাষ্ট্র প্রধানের আনুগত্য করা জরুরী। কিন্তু রাষ্ট্রপ্রধান যদি ইসলামী নীতি বিরোধী কোন ফরমান জারি করেন, তবে তা মানা জায়িয নয়।

৬৩. দু'পক্ষের কলহ মিটিয়ে দেয়া

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, কোন দুই দল মুসলমান যদি ঝগড়া-লড়াই করে, তবে তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দাও। এ ক্ষেত্রে যদি এক দল অন্য দলের ওপর অত্যাচার করে, তবে অত্যাচারীদের বিরুদ্ধে লড়াই করো, যে যাবৎ না তারা আল্লাহর দিকে রুজু হয়।। সূত্র: সূরা হুজুরাত, আয়াত ৯।।

৬৪. সৎকাজে পরস্পরে সহায়তা করা

আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, সৎকাজ ও পরহেযগারীর বিষয়ে একে অন্যের সহায়তা করা।। সূত্র: সূরা মায়িদা, আয়াত-২।।

আক্ষেপের বিষয়, আজকাল যদি কেউ পরহেযগারী অবলম্বন করে ধর্ম পালন করা শুরু করে তাহলে তার সহায়তা তো দূরের কথা, তাকে উল্টো আরো ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা হয়। আর যদি কেউ কোন ভালো কিছু শুরু করে, তবে তৎসংশ্লিষ্ট সব বোঝা তারই মাথার ওপর ফেলে রাখা হয় এবং সেই সৎকাজকে তার ব্যক্তিগত ভেবে অন্যেরা তার কোন সহযোগিতা করতে চায় না। এটা উচিৎ নয়।

৬৫. 'আমর বিল মারুফ ও নাহী আনিল মুনকার' করা

আমার বিল মারুফ অর্থ- (নিজে সৎকাজ করার পাশাপাশি) অপরকে সৎকাজের দিকে দাওয়াত দেয়া এবং নাহী আনিল মুনকার অর্থ (নিজে অসৎ কাজ থেকে বিরত থাকার পাশাপাশি) অন্যকে অসৎকাজে নিষেধ করা।

আল্লাহ তা'আলা বলেন-

ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ المفلحون

তোমাদের মধ্যে এমন এক দল লোক হওয়া আবশ্যক, যারা মানুষকে দ্বীনের দিকে ডাকবে। তারা অপরকে সৎকাজের আদেশ করবে এবং অসৎকাজ হতে ফিরিয়ে রাখতে চেষ্টা করবে। (যারা এরূপ হবে) তাদেরই (ইহলৌকিক ও পরলৌকিক) জীবন সার্থক ও সফলকাম।। সূত্র: সূরা আলে ইমরান, আয়াত-১০৪)

৬৬. হদ বা ইসলামী দণ্ডবিধি কায়িম করা

হযরত রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন-একটি হদ কায়িম করা চল্লিশ দিনের বৃষ্টি অপেক্ষা অধিক ভাল। অর্থাৎ সুসময়ে চল্লিশ বার বৃষ্টি হলে, দেশে

যত পরিমাণ বরকত আসে, একটি হদ কায়িম করলে তদাপেক্ষা অধিক বরকত আসে। (সূত্র: ইবনে মাজাহ, পৃষ্ঠা-১৮২।।

৬৭. জিহাদ করা বা দ্বীন জারি করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করা

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন-তোমাদের ওপর জিহাদ ফরজ করা হল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, জিহাদ কিয়ামত পর্যন্ত জারী থাকবে।। সূত্র: আবু দাউদ শরীফ, খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-৩৪৩ ও মিশকাত শরীফ খণ্ড-১, পৃষ্ঠা ১৮।।

এ হাদীস দ্বারা বোঝা যায়, আখেরী উম্মতের জন্য শুধু ব্যক্তিগত ইবাদত নাজাতের জন্য যথেষ্ট নয়; বরং আল্লাহর জমিনে দ্বীন কায়িমের জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালানো এবং প্রয়োজনে সশস্ত্র জিহাদে অংশগ্রহণ করে জান বিসর্জন দিতে প্রস্তুত থাকা জরুরী।

৬৮. আমানতদারী ও দিয়ানতদারী রক্ষা করা

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যার মধ্যে আমানতদারী নেই, তার ঈমান নেই।। সূত্র: বাইহাকী শরীফ শুআবুল ঈমান খণ্ড-৪ পৃষ্ঠা-৭৮ ও মিশকাত শরীফ, খণ্ড-১, পৃষ্ঠা ১৫।।

৬৯. মানুষকে করজে হাসানা দেয়

হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, দান করলে, দশগুণ সওয়াব পাওয়া যায়; আর করজে হাসানা দিলে আঠার গুণ সওয়াব অর্জিত হয়। (সূত্র:ইবনে মাজাহ। পৃষ্ঠা-১৭৫।।

৭০. পাড়া-প্রতিবেশীর সাথে সদ্ব্যবহার করা

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর এবং কিয়ামত দিবসের ওপর ঈমান বজায় রাখতে চায়, সে যেন পাড়া-প্রতিবেশীদের সঙ্গে সদ্ব্যবহার করে এবং তাদেরকে কষ্ট না দেয়। (সূত্র: বুখারী খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৮৮৯, মুসলিম শরীফ খণ্ড-১ পৃষ্ঠা-৫০

৭১. কারবারের মধ্যে সততা ও সদাচার অবলম্বন করা

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, ব্যবসায়ীদেরকে কিয়ামতের দিন ভীষণ প্রকৃতির ফাসিকরূপে উঠানো হবে। কিন্তু যারা আল্লাহর ভয় দিলে রেখেছে, সদাচারের সাথে বিশুদ্ধ কারবার করেছে এবং সত্য-কথা বলেছে, তারা নাজাত পাবে।। সূত্র: তিরমিযী শরীফ, খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-২৩০।

৭২. অর্থ-সম্পদের সদ্ব্যবহার করা

আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, অনর্থক অপচয় করো না। (সূত্র: সূরা আরাফ, আয়াত-৩১।।

বুখারী শরীফে আছে, হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তোমাদের তিনটি কাজ পছন্দ করেন না। অতিরিক্ত কথা বলা, অর্থের অপব্যবহার করা এবং অতিরিক্ত প্রশ্ন ও তর্ক-বাহাস করা। (সূত্র: বুখারী শরীফ, খণ্ড-পৃষ্ঠা-২০০

৭৩. সালামের জবাব দেয়া

হযরত রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, এক মুসলমানের ওপর অন্য মুসলমানের পাঁচটি হক আছে-ক, সালাম দিলে, জবাব দেয়া। খ. রুগ্ন হলে, সেবা-শুশ্রুষা করা। গ. মৃত্যুবরণ করলে, কাফন-দাফন করা। ঘ. ডাক দিলে বা দাওয়াত দিলে, সে ডাকে সাড়া দেয়া। ৩. হাঁচি দিলে, জবাব দেয়া। (সূত্র: খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-১৬৬ মুসলিম খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-২১৩।।

৭৪. হাঁচিদাতার জবাব দেয়া

হাঁচিদাতার জবাব হচ্ছে, হাঁচিদাতা হাঁচি দিয়ে যখন 'আল-হামদুলিল্লাহ' বলে আল্লাহর শুকর আদায় করবে, তখন শ্রবণকারী 'ইয়ারহামুকাল্লাহ' বলে তাকে দু'আ দিবে। হাঁচিদাতার জবাবে এ দু'আ দানের তাৎপর্য হচ্ছে, মুসলমান ভাইয়ের খুশিতে খুশি হওয়া এবং তার দুঃখে দুঃখিত হওয়া। অর্থাৎ এ দু'আর মাধ্যমে প্রকাশ করা হচ্ছে যে, তার সামান্যতম খুশিতেও আমরা খুশি।

৭৫. কাউকেও কোনরূপ কষ্ট না দেয়া

হযরত রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, মুসলমান সেই ব্যক্তি, যে হাতের দ্বারা, মুখের দ্বারা, বা অন্য কোন ব্যবহারের দ্বারা কাউকেও কোনরূপ কষ্ট দেয় না। অর্থাৎ সে কারো কোন ক্ষতি করে না। [সূত্র: বুখারী শরীফ, খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-৬।।

৭৬। অবৈধ খেলাধুলা ও রঙ-তামাশা হতে বেঁচে থাকা

হযরত রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, তিন প্রকার খেলা ব্যতীত যত খেলাধুলা আছে, সবই অনর্থক অর্থাৎ পাপের কাজ। সে তিন প্রকার হচ্ছে, জিহাদের জন্যে তীর নিক্ষেপ শিক্ষা করা, জিহাদের জন্য ঘোড়া দৌড়ানো শিক্ষা করা এবং

স্ত্রীর মন রক্ষার্থে তার সাথে কিছু হাসি-রসিকতা করা।। সূত্র: তিরমিযী শরীফ। খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-২৯৩।।

আল্লাহ তা'আলার হুকুম পূর্ণ করার জন্য শক্তি ও সুস্বাস্থ্য" জরুরী। সেই নিয়তে কিছু ব্যায়াম, শরীর চর্চা বা জায়িয খেলাধুলা অনর্থক কাজের মধ্যে শামিল নয়।

রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক জিনিস সরিয়ে ফেলাকে হাদীস শরীফে ঈমানের সবচেয়ে ছোট শাখা হিসেবে বলা হয়েছে। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে-ঈমানের সত্তরের উপরে শাখা আছে, তন্মধ্যে সর্বনিম্ন শাখা হলো, রাস্তা হতে কষ্টদায়ক জিনিস সরিয়ে ফেলা।। সূত্র: মুসলিম শরীফে, খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-৪৭।।

প্রমাণসহ বিস্তারিত জানার জন্যে হাকীমুল উম্মত মুজাদ্দিদুল মিল্লাত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহ. এর অমর গ্রন্থ 'ফুরুউল ঈমান' পাঠ করুন। এছাড়াও হযরত থানভী রহ.-এর 'হায়াতুল মুসলিমীন, হুকুকুল ইসলাম, বেহেশতী যেওর, সাফাইয়ে মু'আমালাত' এবং তাঁর পছন্দনীয় ইমাম গাযালী রহ. এর-'তা'লীমুদ্দীন' প্রভৃতি কিতাব সহীহ ইসলামী যিন্দেগী গঠন ও পরিপূর্ণ ঈমান ও আমল অর্জনের জন্য বড়ই উপকারী।

অধ্যায় তিন - কুফর, শিরক ও গুনাহে কবীরা

শিরক ও বিদ'আতের বর্ণনা

ঈমান অপেক্ষা মূল্যবান রত্ন ও অতিপ্রয়োজনীয় সামগ্রী জগতে আর নেই। মনে-প্রাণে এ অমূল্য রত্নের হেফাযত করা আবশ্যক এবং এর প্রয়োজনীয় সামগ্রীকে প্রাণের চেয়েও অধিক মুহাব্বত করা উচিত।

প্রথম অধ্যায়ে বর্ণিত আক্বীদাগুলো হৃদয়ের মধ্যে গেঁথে রেখে দ্বিতীয় অধ্যায়ে বর্ণিত ঈমানের ৭৭ শাখা হাসিল করলে, ঈমান অত্যন্ত দৃঢ় হবে। আর কতগুলো জিনিস এমন আছে যে, তাতে ঈমান নষ্ট বা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যায়, তার কিছু বর্ণনা এখানে করা হচ্ছে। হাদীস শরীফের বর্ণনা মতে, আখিরী জামানায় ঈমান রক্ষা করা কঠিন হবে। তথাপি সাবধান! জীবন দিয়ে হলেও প্রত্যেক মু'মিনকে তার ঈমানের হেফাযত করতেই হবে। ঈমান চিরস্থায়ী জাহান্নাম থেকে বাঁচার রক্ষাকবচ।

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন- 'যারা সরল পথ।ইসলামের শিক্ষা। প্রকাশ পাওয়ার পর রাসূলের সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিরুদ্ধাচরণ করবে এবং মুসলমানের তরিকা ছাড়া অন্য তরীকা অবলম্বন করবে, আমি তাদেরকে সেই পথগামীই করব এবং পরিণামে জাহান্নামে নিক্ষেপ করব। জাহান্নাম ভীষণ মন্দ জায়গা। আল্লাহর সঙ্গে শরিক করার পাপ কিছুতেই আল্লাহ তা'আলা ক্ষমা করবেন না। এছাড়া অন্যান্য পাপ যার জন্যে যতটুকু ইচ্ছা করেন, ক্ষমা করবেন। যারা আল্লাহর সাথে শরীক করে, তারা মহাপাপী। তারা আল্লাহকে ছেড়ে স্ত্রী জাতির অর্থাৎ দেবীদের এবং খোদার অভিশপ্ত সেই পাপিষ্ঠ শয়তানেরই পূজা করছে, যে মানবজাতির সৃষ্টির লগ্নে বলেছিল- আমি মানবজাতির মধ্য হতে এক দলকে নিজের অনুসারী বানিয়ে তাদেরকে বিপথগামী করব, তাদেরকে নানা দুরাশায় আক্রান্ত করব, আর তাদেরকে গৃহপালিত পশুর কান কাটতে আদেশ করব। আর তা-ই করবে এবং আল্লাহর সৃষ্টিকে পরিবর্তন করতে অর্থাৎ শ্মশ্রুমুণ্ডণ বা দাড়িমুণ্ডণ ইত্যাদি শরী'আত বিরোধী কাজ করতে। আদেশ করব, তারা তাই করবে। বস্তুত যারা আল্লাহকে ছেড়ে শয়তানের আদেশ পালন করবে, তারা ভীষণ ক্ষতিগ্রস্ত হবে। শয়তান তাদের নিকট ওয়াদা করে এবং আশ্বাস বাণী শোনায়, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে শয়তানের ওয়াদা ও আশ্বাস বাণী প্রবঞ্চনা ব্যতীত কিছুই নয়"।। সূত্র: সূরা নিসা, আয়াত ১৫-১৬।।

শিরক, বিদ'আত, জাহিলিয়্যাতের রসম ও শয়তানের পায়রবি যে কত জঘন্য অন্যায়, নিন্দনীয় এবং ঈমানের জন্যে অনিষ্টকর, উপরোক্ত আয়াতগুলো দ্বারা তা স্পষ্টই বোঝা যায়। এসব কাজ করলে তাওহীদ ও রিসালাতের আক্বীদা নষ্ট হয় এবং ইমানের নূর ও রশ্মি চলে গিয়ে

তথায় অন্ধকার বিস্তার লাভ করে। তাই ঈমানের বিষয়াবলী ও ইসলামী আক্বায়িদ বর্ণনা করার পর সাধারণের মাঝে প্রচলিত বিভিন্ন বদ রসম ও বড় বড় গুনাহ (গুনাহে কবীরা। বর্ণনা করে

দেওয়া সমীচীন মনে করছি। ঈমানদারগণ উক্ত বিষয়গুলো সঠিকভাবে জেনে সেগুলো হতে বিরত থেকে নিজ নিজ ঈমানের হেফাযত করতে চেষ্টা করবেন বলে আশা করি।

প্রচলিত বদ রসমসমূহের মধ্যে কতগুলো কুফর ও শিরক পর্যায়ের, আর কতগুলো কুফর ও শিরক তো নয়, কিন্তু কুফর ও শিরকের কাছাকাছি, আর কতগুলো বিদ'আত ও গোমরাহী এবং কতগুলো হারাম, মাকরূহ ও গুনাহে কবীরা। সবগুলো থেকেই বেঁচে থাকা আবশ্যক। তবেই ঈমান গ্রহণীয় ও সর্বাঙ্গীণ সুন্দর হবে।

শিরক কাজসমূহ

নিম্নলিখিত কাজগুলো শিরক। এসব হতে দূরে থাকা অপরিহার্য কর্তব্য-

১. কোন বুযুর্গ বা পীর সম্বন্ধে এ রকম আক্বীদা রাখা যে, তিনি সবসময় আমাদের সব অবস্থা জানেন। ২. জ্যোতির্বিদ, গণক, ঠাকুরদের নিকট অদৃষ্টের কথা জিজ্ঞেস করা। ৩. কোন পীর-বুযুর্গকে দূরদেশ থেকে ডাকা এবং মনে করা যে, তিনি তা শুনতে পেয়েছেন। ৪. কোন পীর-বুযুর্গ, জিন-পরী বা ভূত-ব্রাহ্মণকে লাভ-লোকসানের মালিক মনে করা। ৫. কোন পীর বুযুর্গের কবরের নিকট আওলাদ বা অন্য কোন উদ্দেশ্যের কথা জানিয়ে প্রার্থনা করা। ৬. পীর বা কবরকে সিজদা করা। ৭. কোন পীর-বুযুর্গের নামে শিরনি, সদকা বা মান্নত মানা। ৮. কোন পীর-বুযুর্গের দরগাহ বা কবরের চতুর্দিক দিয়ে তওয়াফ করা। ৯. আল্লাহর হুকুম ছেড়ে অন্য কারো আদেশ বা সামাজিক প্রথা পালন করা। ১০. কারো সামনে মাথা নিচু করে সালাম করা বা হাত বেঁধে নিস্তব্ধ দাঁড়িয়ে থাকা। ১১. মুহাররমের সময় তাজিয়া বানানো। ১২. কোন পীর-বুযুর্গের নামে জানোয়ার যবেহ করা বা কারো দোহাই দেওয়া। ১৩. পীরের বাড়ির বা কোন বুযুর্গের দরগাহ বা তীর্থকে, কাঁবা শরীফের মতো আদব বা তা'যিম করা। ১৪. কোন পীর-বুযুর্গ বা অন্য কারো নামে ছেলের নাক, কান ছিদ্র করা, আংটি পরান, চুল রাখা, টিকি রাখা ইত্যাদি ১৫. আলী বখশ, হোসাইন বখশ ইত্যাদি নাম রাখা। ১৬. কোন জিনিসের বা ব্যারাম-পীড়ার ছুত লাগে বলে বিশ্বাস করা। ১৭. মুহররম মাসে পান না খাওয়া, নিরামিষ খাওয়া, খিচুড়ি খাওয়া ইত্যাদি। ১৮. নক্ষত্রের তাছির মানা বা তিথি পালন করা। ১৯. ভালো-মন্দ বা বার তারিখ জিজ্ঞেস করা। যেমন, অনেকে জিজ্ঞেস করে, এই চাঁদে বিবাহ শুভ কি-না? কোন দিন নতুন ঘরে যেতে হয়? রোববারে বাঁশ কাটা যায় কি-না? ইত্যাদি। ২০. গণকের নিকট বা যার ঘাড়ে জিন সওয়ার হয়েছে, তার নিকট হাত দেখিয়ে অদৃষ্ট জিজ্ঞেস করা। ২১. কোন

জিনিস হতে কু-লক্ষণ ধরা বা কুযাত্রা মনে করা। যেমন, যাত্রামুখে কেউ হাঁচি দিলে অনেকে সেটাকে কু-যাত্রা মনে করে থাকে। ২২. কোন দিকে যাত্রা করার সময় ঘরের দুয়ারে মা খাকি বলে সালাম করে বিদায় গ্রহণ করা। ২৩. কোন দিন বা মাসকে অশুভ মনে করা। ২৪. কোন বুযুর্গের নাম ওজীফার মতো জপ করা। ২৫. এ রকম বলা যে, আল্লাহ ও রাসূলের মর্জি থাকলে এ কাজ হবে, বা আল্লাহ-রাসূল যদি চান, তবে এ কাজ হবে। ২৬. এ রকম, বলা যে, উপরে খোদা, নিচে আপনি। ২৭. কারো নামের কসম খাওয়া বা যিকির করা। কাউকে 'পরম পূজনীয়' সম্বোধন করে লেখা, 'কষ্ট না করলে কেষ্ট পাওয়া যায় না' বলা, 'জয়কালী নেগাহবান' ইত্যাদি বলা। ২৮. তেমাথা পথে ভেট দেওয়া, পূজা উপলক্ষে কর্ম বন্ধ রাখা, দোল-পূজায় আবির মাখানো, বিষকরম পূজায় ছাতু খাওয়া, পৌষ মাস সংক্রান্তিতে গরু দৌড়ানো, ঘোড়া দৌড়ানো, আশ্বিন মাস সংক্রান্তিতে গাশ্চি, গোফাগুণে পূজা উপলক্ষে আমোদ উৎসব, নতুন কাপড় ক্রয়, পার্বণী দেয়া, মনসা পূজা বা জন্মাষ্টমী উপলক্ষে নৌকা দৌড়ানো। হিন্দুদের আড়ঙ্গে, মিছিলে, উৎসবে যাওয়া। ২৯. ছবি, ফটো বা মূর্তি রাখা, বিশেষ করে কোন বুযুর্গের ফটো তা'যিমের জন্য রাখা।বিদ'আতের বর্ণনা

নিম্নলিখিত কাজগুলো বিদ'আত। এগুলো থেকে দূরে থাকা কর্তব্য।

১. কোন বুযুর্গের মাযারে ধুমধামের সাথে উরস করা, মেলা বসানো, বাতি জ্বালানো। ২. মেয়েলোকের বিভিন্ন দরগায় যাওয়া। ৩. কবরের ওপর চাদর, আগরবাতি, মোমবাতি ও ফুল দেওয়া। ৪. কবর পাকা করা। ৫. কোন বুযুর্গকে খাওয়া। ৭. কবরে সিজদা করা। ৮. দ্বীনের বা দুনিয়ার কাজের ক্ষতি করে সন্তুষ্ট করার জন্যে শরী'আতের সীমারেখার বেশি তাযিম করা। ৬. কবরে চুমো দরগায়-দরগায় বেড়ানো। ৯. কোন কোন অজ্ঞ লেখক আজমীর শরীফ, বাজেবোস্তান, পীরানে কার্লিয়ার ইত্যাদিকে মুসলমানদের তীর্থস্থান বলে উল্লেখ করেছে, তা দেখে তীর্থ গমনের ন্যায় সেসব স্থানে যাওয়া। ১০.। উঁচু উঁচু কবর বানানো। ১১. কবর সাজানো, সেখানে ফুলের মালা দেওয়া। ১২. কবরে গম্বুজ বানানো। ১৩. কবরে পাথর খোদাই করে কিছু লিখে লাগানো। ১৪. কবরে চাদর, শামিয়ানা ইত্যাদি টানানো। ১৫. মাযারে মিঠাই নজরানা দেওয়া।

কবীরা গুনাহের বর্ণনা

কবীরা গুনাহ করলে ঈমান অত্যন্ত কমজোর হয়ে পড়ে এবং অনেক দিনের ইবাদত-বন্দেগীর দ্বারা অর্জিত নূর নষ্ট হয়ে যায়। আর এর ভয়াবহতা এমন যে, একটি গুনাহে কবীরাই মানুষকে জাহান্নামে নেয়ার জন্যে যথেষ্ট। তাওবা ছাড়া গুনাহে কবীরা মাফ হয় না। কবীরা গুনাহকে জায়িয বা হালাল মনে করলে ঈমান চলে যায়।

এখানে কতগুলো কবীরা গুনাহের তালিকা দেওয়া হলো। প্রত্যেকেরই এসব গুনাহ হতে বেঁচে নিজ নিজ ঈমানের হেফাযত করা অবশ্য কর্তব্য।

১. শিরক করা। ২. মা-বাপকে কষ্ট দেয়া। ৩. যিনা করা। ৪. এতিমের মাল খাওয়া। ৫. জুয়া খেলা। ৬. বিনা প্রমাণে কারো ওপর তুহমত লাগানো। ৭. জিহাদ হতে অর্থাৎ কাফিরদের সাথে যে ধর্মযুদ্ধ হয়, তা থেকে পলায়ন করা। ৮. মদ [শরাব পান করা। ৯. কোন লোকের ওপর অত্যাচার করা। ১০. গীবত করা অর্থাৎ অসাক্ষাতে কারো নিন্দা করা। ১১. কারো প্রতি বদগোমানী করা, অর্থাৎ অনর্থক কাউকে মন্দ মনে করা। ১২. নিজেকে ভালো মনে করা। ১৩. অন্তরে আল্লাহর ভয় না রাখা বা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ে যাওয়া। ১৪. ওয়াদা করে তা পূরণ না করা। ১৫. পাড়া-প্রতিবেশীর ঝি-বৌকে কু-নজরে দেখা। ১৬. আমানতের খেয়ানত করা। ১৭. ফরয কাজ না করা, যেমন নামায না পড়া, রমযানের রোযা না রাখা, যাকাত না দেওয়া, হজ্জ না করা ইত্যাদি। ১৮. কুরআন শরীফ পড়ে ভুলে যাওয়া। ১৯. সত্য সাক্ষ্য গোপন করা। ২০. মিথ্যা কথা বলা। ২১. মিথ্যা কসম খাওয়া। ২২. কারো জানের, মালের বা ইজ্জতের হানি করা। ২৩. আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে সিজদা করা। ২৪. জুমু'আর নামায না পড়া। ২৫. ওয়াক্তিয়া নামায না পড়া। ২৬. কোন মুসলমানকে কাফির বলা। ২৭. কারো গীবত করা বা শোনা। ২৮. চুরি করা। ২৯. জালিম-অত্যাচারীদের তোশামোদ করা। ৩০. সুদ বা ঘুষ খাওয়া। ৩১. অন্যায় বিচার করা। ৩২. কোন জিনিস মেপে দিতে কম দেওয়া এবং নেওয়ার সময় বেশি নেওয়া। ৩৩. দাম ঠিক করে পরে জোর-জবরদস্তি করে কম দেওয়া। ৩৪. বালকদের সাথে কু-কর্ম করা। ৩৫. হায়িয ও নিফাস অবস্থায় বা মলদ্বারে স্ত্রী সহবাস করা। ৩৬. ধান-চাউলের অধিক দর দেখে খুশি হওয়া। ৩৭. বেগানা স্ত্রীলোককে দেখা বা তার সাথে কথাবার্তা বলা বা তার নিকটে একা একা বসা। তেমনিভাবে মহিলাদের জন্যে বেগানা পুরুষকে দেখা বা তার সঙ্গে বেপর্দা কথা বলা বা দেখা দেওয়া। ৩৮. গরু-বাছুরের সাথে কু-কর্ম করা। ৩৯. কাফিরদের রীতি-নীতি পছন্দ করা। ৪০. গণকের কথা ঠিক মনে করা। ৪১. নিজেকে বড় মুসল্লি ও বড় পরহেযগার বলে দাবি করা। ৪২. প্রিয়জনের বিয়োগে সিনা পিটিয়ে চিৎকার করে ক্রন্দন করা। ৪৩. খাওয়ার জিনিসকে মন্দ বলা। ৪৪. নাচ দেখা। ৪৫. লোক দেখানোর জন্যে ইবাদত করা। ৪৬. গান-বাদ্য শোনা। ৪৭. অন্যের ঘরে বিনা অনুমতিতে প্রবেশ করা। ৪৮. অবৈধ কাজ করতে দেখে ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও নসিহত না করা। ৪৯. হাসি-ঠাট্টা করে কাউকে অপমানিত করা। ৫০. কারো দোষ অন্বেষণ করা। ৫১. জমিনের আইল বা লাইন ভেঙে সীমানা পরিবর্তন করা। ৫২. মানুষ খুন করা। ৫৩. কুরআন-সুন্নাহর শিক্ষার বিরুদ্ধাচরণ করা। ৫৪. ভিডিও, টিভি ভিসিআর ক্রয় এবং তা ঘরে রাখা ও দেখা। ৫৫. সিনেমা হল প্রতিষ্ঠা করা, পরিচালনা করা বা সিনেমা দেখা। ৫৬. নাট্য ও নৃত্য অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা বা দেখা। ৫৭. সুন্দরী প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা বা

তাতে অংশগ্রহণ করা। ৫৮. পতিতালয় প্রতিষ্ঠা করা বা তার সহযোগিতা করা। ৫৯. প্রমোদবালার পেশা গ্রহণ করা। ৬০. খাজাবাবা বা জারিগানের আসর বসানো বা তাতে অংশগ্রহণ করা। ৬১. সাবালকদের হাফপ্যান্ট পরে চলাফেরা করা বা খেলাধুলা করা। ৬২. গান ও নৃত্য শিক্ষা করা বা শিক্ষা দেওয়া। ৬৩. বীমা, ইন্স্যুরেন্সে অংশগ্রহণ করা।পাপ কাজে দুনিয়ার ক্ষতি নেক কাজ করার আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে-আল্লাহ তা'আলাকে সন্তুষ্ট করা আখিরাতের সুখ লাভ করা এবং পাপকাজ হতে বেঁচে থাকার আসল উদ্দেশ হচ্ছে আখিরাতের আযাব ও খোদার গযব হতে মুক্তিলাভ করা। কিন্তু আজকাল সাধারণত লোকেরা দুনিয়ার লাভ লোকসানটাকেই বেশি বুঝে। তাই পাপ করলে দুনিয়াতে কি কি ক্ষতি হয় এবং নেক কাজ করলে দুনিয়াতে কি কি লাভ হয়, তার কিছু বর্ণনা এখানে দেয়া হল। আশা করা যায় যে, লোকেরা অন্তত দুনিয়ার লাভের আশায় কিছু নেক কাজ করবে এবং দুনিয়ার লোকসানের ভয়ে পাপ কাজগুলো ত্যাগ করবে।

পাপ করার দরুন যেসব ক্ষতি হয় তা নিম্নরূপ

১. দ্বীনী ইলম হতে মাহরুম ও বঞ্চিত থাকতে হয়। ২. কামাই রোষগারের বরকত উঠে যায়। ৩. খোদার প্রতি মুহাব্বত থাকে না। ৪. সৎলোকের কাছে যেতে ইচ্ছা হয় না। ৫. কাজে-কর্মে অনেক বাধা-বিঘ্ন এসে পড়ে। ৬. অন্তর কাল হয়ে যায়। ৭. হৃদয়ের বল থাকে না। ৮. নেক কাজ হতে মাহরুম থাকতে হয়। ৯. হায়াত কাটা যায়। ১০. এক গুনাহের পর অন্য গুনাহ সংঘটিত হতে থাকে, তওবা করবার ইচ্ছা ক্রমশ কমজোর হতে থাকে। ১১. কিছু দিন পর পাপের প্রতি যে একটা ঘৃণা ছিল, সেটাও চলে যায়। ১২. মন্দ কাজে নমরূদ, শাদ্দাদ, ফিরআউন, আবু জাহল প্রমুখ আল্লাহর দুশমনদের উত্তরাধিকারী ও সহগামী হতে হয়। ১৩. আল্লাহর নিকট মান-সম্মান কিছুই থাকে না। ১৪. অন্যান্য জীবজন্তু পাপের দরুন কষ্ট পেয়ে পাপীর প্রতি লা'নত করে। ১৫. জ্ঞান-বুদ্ধি হ্রাস পেতে থাকে। ১৬. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বদ দু'আর ভাগী হতে হয়। ১৭. ফেরেশতাদের নেক দু'আ হতে মাহরুম থাকতে হয়। ১৮. দেশের শস্য-ফসলাদিতে বরকত থাকে না। ১৯. শরম-ভরম চলে যায়। ২০. আল্লাহ তা'আলার ভক্তি অন্তর হতে উঠে যায়। ২১. আল্লাহর নেয়ামত হতে মাহরুম হয়ে যায়। ২২. বালা-মুসীবত নাযিল হয়। ২৩. তাঁকে প্রশংসাস্থলে নিন্দা করা হয়। ২৪. শয়তান তার চিরসাথী হয়ে যায়। ২৫. তার দিল পেরেশান থাকে। ২৬. মৃত্যুকালে তার মুখ দিয়ে কালিমা বের হয় না। ২৭. খোদা তা'আলার রহমত হতে নিরাশ হয়ে অবশেষে তাওবা ব্যতিরেকেই তার মৃত্যু হয় ইত্যাদি।

নেক কাজে দুনিয়া লাভ

১. নেক কাজ করার ফলে কামাই রোযগারে বরকত হয়। ২.কষ্ট ও অশান্তি দূর হয়। ৩. দিলের মকসুদ সহজে পুরা হয়। ৪. জীবনে শান্তি পাওয়া যায়। ৫. দেশে রীতিমত বৃষ্টি হয়। ৬. অতি বৃষ্টি বা অনাবৃষ্টি হয় না। ৭. বালা মুসীবত দূর থাকে, মালও বাড়তে থাকে ৮. আল্লাহ তা'আলা সকল কাজে মদদগার হন। ৯. নেক লোকের অন্তর নেক কাজের প্রতি মজবুত রাখার জন্য ফেরেশতাদের হুকুম করা হয়। ১০. খাঁটি সম্মান পাওয়া যায় এবং মর্যাদা বৃদ্ধি হয়। ১১. লোকের অন্তরে মুহাব্বত সৃষ্টি হয়। ১২. কুরআন শরীফ তার জন্য রহমত হয়। ১৩. জানের বা মালের ক্ষতি হলে তার পরিবর্তে উত্তম জিনিস পাওয়া যায়। ১৪. ক্রমশ নেয়ামত বৃদ্ধি পেতে মৃত্যুকালে ফেরেশতাগণ সুসংবাদ শুনান। ১৯. অভাবের সময় মদদ পাওয়া যায়। ২০. অন্তরের বিশৃঙ্খল চিন্তা-ভাবনা দূর হয়। ২১. রাজত্ব ও কর্তৃত্ব স্থায়ী হয়। ২২. আল্লাহর গজব দূর হয়। ২৩. আয়ু বৃদ্ধি পায়। ২৪. অনাহার ও অর্ধাহারের কষ্ট হতে মুক্তি পাওয়া যায়। ২৫. অল্প জিনিসে বেশী বরকত হয় ইত্যাদি।

ঈমান ভঙ্গের কারনসমূহ

ঈমান ভঙ্গের কারন অনেক। তন্মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ কিছু কারন নিয়ে আলোচনা করা হলো :

ঈমান ভঙ্গের ১০টি কারণ – দলীলসহ

১) শিরক করা

📖 দলীল: কুরআন

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ﴾

“নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর সঙ্গে শিরককে ক্ষমা করবেন না।”

— সূরা নিসা: ৪৮

﴿إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ﴾

“যে আল্লাহর সঙ্গে শিরক করে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাত হারাম করেছেন।”

— সূরা মায়িদা: ৭২

📚 দলীল: হাদিস

রাসুল ﷺ বলেছেন:

“শিরক করা সবচেয়ে বড় গুনাহ।”

— সহিহ বুখারি

২) আল্লাহ বা রাসূল ﷺ-কে অস্বীকার করা

📖 দলীল: কুরআন

﴿وَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا﴾

“যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনে না, তাদের জন্য আমরা জ্বলন্ত আগুন তৈরি রেখেছি।”

— সূরা ফাতহ: ১৩

📚 দলীল: হাদিস

নবী ﷺ বলেছেন:

“আমি আদেশ করেছি—তোমরা মানুষকে সাক্ষ্য দিতে বলো: আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই এবং আমি আল্লাহর রাসূল।”

— সহিহ মুসলিম

৩) কুরআন, হাদিস বা শরিয়তকে উপহাস করা

📖 দলীল: কুরআন

﴿قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ ۝ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ﴾

“বলুন: আল্লাহ, তাঁর আয়াত ও তাঁর রাসূলকে কি তোমরা উপহাস করেছিলে?
অজুহাত দিও না—তোমরা ঈমানের পর কাফির হয়ে গেছ।”

— সূরা তাওবা: ৬৫–৬৬

৪) ইসলামের কোনো নিশ্চিত বিধান অস্বীকার করা

📖 দলীল: কুরআন

﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُون﴾

“যে আল্লাহ প্রেরিত বিধান অনুযায়ী বিচার করে না—সে কাফির।”

— সূরা মায়িদা: ৪৪

📚 হাদিস

নবী ﷺ বলেছেন:

“যে আমার নিয়ে আসা বিষয় অস্বীকার করে—সে কাফির।”

— মুসনাদ আহমদ

৫) আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও জন্য ইবাদত করা

📖 দলীল: কুরআন

﴿وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا﴾
"মসজিদসমূহ আল্লাহর জন্য, সুতরাং আল্লাহর সঙ্গে কাউকে ডাকো না।"
— সূরা জিন: ১৮

📚 হাদিস ,নবী ﷺ বলেছেন:
"দোয়া ইবাদত।"
— তিরমিযি
সুতরাং অন্য কারও কাছে দোয়া করা শিরক—ঈমান নষ্ট করে।

৬) ইসলামের বদলে মানুষের আইনকে উত্তম মনে করা

📖 দলীল: কুরআন

﴿أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ﴾
"তারা কি জাহেলিয়াতের আইন কামনা করে?"
— সূরা মায়িদা: ৫০

﴿وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا﴾
"আল্লাহর বিধানের চাইতে উত্তম বিধান আর কার?"
— সূরা মায়িদা: ৫০

৭) ইসলাম ত্যাগ করা (মুরতাদ হওয়া)

📖 দলীল: কুরআন

﴿وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ﴾
"তোমাদের মধ্যে যে তার ধর্ম ত্যাগ করবে এবং কাফির অবস্থায় মারা যাবে—তার আমল নষ্ট হয়ে যাবে।"

— সূরা বাকারা: ২১৭

৮) জাদু শেখা, করা বা বিশ্বাস করা

📖 দলীল: কুরআন

﴿وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّىٰ يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ﴾

“তারা কাউকে জাদু শেখাত না—যতক্ষণ না বলত: ‘আমরা পরীক্ষা; কাজেই তুমি কুফরি করো না।’ ”

— সূরা বাকারা: ১০২

📚 হাদিস

নবী ﷺ বলেছেন:

“সাতটি ধ্বংসকারী গুনাহের মধ্যে একটি হলো—জাদু করা।”

— সহিহ বুখারি, মুসলিম

৯) সকল ধর্মকে সত্য বলা (ধর্ম সমতা বিশ্বাস)

📖 দলীল: কুরআন

﴿وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ﴾

“যে ইসলাম ছাড়া অন্য ধর্ম চায়—তা কখনো গ্রহণ করা হবে না।”

— সূরা আলে ইমরান: ৮৫

১০) কুফরি বা শিরকে খুশি হওয়া বা সমর্থন করা

📖 দলীল: কুরআন

﴿لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ... يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾

“তুমি এমন কাউকে পাবে না যারা আল্লাহর প্রতি ঈমানদার, আর আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরোধীদের প্রতি বন্ধুত্বপূর্ণ।”

— সূরা মুজাদালা: ২২

শেষ কথা

এসব বিষয় কেউ যদি—জেনে বুঝে,ইচ্ছাকৃতভাবে,স্বীকার করে

অবলম্বন করে, তবে তার ঈমান মারাত্মকভাবে নষ্ট হতে পারে।
তবে যদি অজ্ঞতা, ভুল বোঝা, বা আবেগে কোনো ভুল কথা বলে—
তাকে ব্যাখ্যা করলে বোঝানো উচিত, এবং তওবা করলে আল্লাহ ক্ষমা করেন।

তাওবার বয়ান

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, "হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহর নিকট খাঁটিভাবে তাওবা কর"।। সূত্র: সূরা তাহরীম, আয়াত-৭।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "গুনাহ থেকে তাওবাকারী এমন পবিত্র হয়ে যায় যে, যেন তার কোন গুনাহই নেই"।। সূত্র: ইবনে মাজাহ, পৃষ্ঠা-৩১৩।
খালিস তাওবা কাকে বলে? জনৈক বুযুর্গ অতি সংক্ষেপে তাওবার ব্যাখ্যা এভাবে প্রদান করেছেন, "গুনাহের কারণে মনের ভিতর অনুতাপের আগুণ জ্বলাকেই তাওবা বলে"।
ইবনে মাসউদ রাযি. বলেন, "অনুতপ্ত হওয়াই তাওবা"।। সূত্র: ইবনে মাজাহ, পৃষ্ঠা-৩১৩।

খালিস তাওবার জন্য কয়েকটি শর্ত আছে: ১. গুনাহের কাজ স্মরণ করে মনে মনে লজ্জিত হওয়া এবং মনের মধ্যে দুঃখ অনুভব করা। ২. সঙ্গে সঙ্গে ঐ অন্যায় কাজ তরক করে দেয়া। ৩. ভবিষ্যতের জন্য মনে মনে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করা যে, আর কখনো এমন কাজ করব না এবং নফস যখন আবার সেই কাজ করার খায়েশ হয়, তখন তাকে দমন করে রাখা। আর খোদার কাছে এমন কাকুতি-মিনতি করে মাফ চাওয়া, যেমনিভাবে মাফ চেয়ে থাকে কোন চাকর যখন সে তার মালিকের নিকট অপরাধ করে ফেলে। সে কাকুতি-মিনতি করে মালিকের হাত জড়িয়ে ধরে, একবারের জায়গায় দশবার করে মাফ চায়। তাই খোদার কাছে অন্তত এতটুকু তো করা উচিত।
আর উক্ত ত্রুটির জন্য তাওবার সাথে সাথে শরী'আতে বর্ণিত পদ্ধতিতে প্রতিকার শুরু করে দেয়া উচিত। যেমন, নামায, রোযা, যাকাত ইত্যাদি আদায় না করে থাকলে, সেগুলো হিসেব করে আদায় করা উচিত। কিন্তু সেগুলোর চূড়ান্ত হিসাব করা সম্ভব না হলে, মনের প্রবল ধারণার ভিত্তিতে হিসাব করে পিছনের সবগুলোর কাযা আদায় শুরু করে দেয়া কর্তব্য। কাযা আদায় শেষ হওয়ার পূর্বে মৃত্যু এসে গেলে সেগুলো আদায় করার জন্য ওসীয়ত করে যাওয়া বাঞ্ছনীয়।
আল্লাহ না করুন, কারো থেকে কালিমায়ে কুফর বা শিরক প্রকাশ পেলে তার জন্য কালিমা পড়ে নতুনভাবে ঈমান আনতে হবে এবং বিবাহ দোহরাতে হবে। কেউ যদি অন্যের অর্থ অবৈধভাবে নিয়ে থাকে, তাহলে সে অর্থ নিজের প্রবল ধারণার ভিত্তিতে যে পরিমাণ হয়, তা মূল মালিককে পৌঁছে দিবে। মালিক না থাকলে, তার ওয়ারিসদেরকে পৌঁছে দিবে।

তাদেরকেও না পেলে মূল মালিককে সাওয়াব পৌঁছানোর নিয়তে গরীব মিসকীনদেরকে দান করে দিবে।
এসব বিষয় খালিস তাওবার জন্য একান্ত জরুরী। এরকম খালিস তাওবা করলে আল্লাহর ওয়াদা আছে যে, নিশ্চয়ই তিনি তাওবা কবুল করে নিবেন এবং তাওবাকারীকে ক্ষমা করে মুহাব্বত করবেন।

তাওবা কবুলিয়াত সম্পর্কে আল্লাহ পাক বলেন,

يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون.

عليهم وكان الله عليما ًحكيما ًوليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أَحَدَهُم ُالْمَوْت ُ
قَال َإِنِّي تبت الآن ولا الَّذِين َيَمُوتُون َوَهُم ْكُفَّار ٌأُولَئِك َأَعْتَدْنَا لَهُم ْعَذَابًا

اليما

126/148 "অবশ্যই আল্লাহ তাদের তাওবা কবুল করবেন, যার ভুলবশত মন্দ কাজ করে অনতিবিলম্বে তাওবা করে। এরাই হল সে সব লোক যাদেরকে আল্লাহ ক্ষমা করে দেন। আল্লাহ মহাজ্ঞানী, সর্বজ্ঞ। আর এমন লোকদের জন্য কোন ক্ষমা নেই, যার মন্দ কাজ করতেই থাকে, এমন কি যখন তাদের কারো মাথার উপর মৃত্যু উপস্থিত হয়, তখন বলতে থাকে: আমি এখন তাওবা করছি।

অধ্যায় চার - ইসলামের দৃষ্টিতে গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ও জাতীয়তাবাদ

গণতন্ত্র সমাজতন্ত্র ইসলাম বিরোধী মতবাদ

পৃথিবীতে আল্লাহ তাআলা মানুষকে পাঠিয়েছেন খলীফারূপে, তার প্রতিনিধিত্ব করার জন্য। জান্নাত হতে নির্বাসিত মানুষ যাতে তার সঠিক সরল পথ ভুলে না যায়, সে জন্য যুগে যুগে এ ধরায় আবির্ভূত হয়েছেন অসংখ্য নবী-রাসূল আ.। মানুষের জীবন পদ্ধতির সঠিক রূপরেখা বর্ণনা দিয়ে বহু আসমানী গ্রন্থ এসেছে সেসব নবী-রাসূলগণের আ. মাধ্যম।

শেষনবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মাধ্যমে আমাদের জন্য পবিত্র কুরআনের আলোক বর্তিকা দ্বারা জীবন চলার পথ ও পাথেয় সুস্পষ্ট ও উজ্জ্বল হয়ে আছে। পবিত্র কুরআনের বাস্তব ব্যাখ্যা হচ্ছে হাদীস। ব্যক্তিজীবন থেকে শুরু করে রাষ্ট্রীয় জীবনের প্রতিটি অধ্যায় সম্পর্কে পবিত্র কুরআন ও হাদীস স্পষ্ট বর্ণনা দিয়েছে। ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রকে ধর্ম ও রাজনীতির একই সূত্র-বন্ধনে আবদ্ধ করেছে ইসলাম। তাই ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে, মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের প্রেরিত ইসলামী মতাদর্শ বাদ দিয়ে কারো ব্যক্তিগত তথা মানব রচিত আইন বা মতবাদ দিয়ে দেশ শাসন করা বা এ জন্য আন্দোলন করা মুসলমানদের জন্য সম্পূর্ণরূপে নাজায়িয। অথচ কমিউনিজম এবং শস্যালিজমের নেতার কথার বুলি আওড়াতে গিয়ে বলে থাকে, "ইসলাম মানব জাতিকে যে সাম্যবাদ শিক্ষা দিয়েছে, আমরা জাতিকে সেই সাম্যবাদের দিকেই আহবান করি। সমতার দিক দিয়ে ইসলামের সাথে আমাদের কোন বিরোধ নেই; বরং ইসলামের শিক্ষাকেই আমরা বাস্তবায়িত করতে চাই সাম্যবাদের মাধ্যমে"।

উক্ত নেতাদের এসব বক্তব্য-বিবৃতি ষোল আনাই ধোঁকা, সত্যের অপলাপ এবং মধুর নামে বিষ পান করানোর অপচেষ্টা মাত্র। শরী'আতের দৃষ্টিতে প্রচলিত সমাজতন্ত্র ও গণতন্ত্রের প্রচার করা হারাম। কারণ, বর্তমান গণতন্ত্রও সমাজতন্ত্র উভয়ই ইসলাম বিরোধী মতবাদ। তেমনিভাবে জাতীয়তাবাদের শ্লোগান আরেক শরী'আতবিরোধী আওয়াজ। আর ধর্মনিরপেক্ষতার মধ্যে তো কোন ধর্মই নেই।

আধুনিক গণতন্ত্রের মূল বক্তব্য হচ্ছে-"জনগণই সকল ক্ষমতার উৎস"। গণতন্ত্রের মর্মবাণীঃ Govt. of the people by the people for the

people. সরকার জনগণের মধ্য হতে, জনগণের দ্বারা জনগণের জন্য নির্বাচিত হবে। অর্থাৎ জনগণই সকল ক্ষমতার উৎস। আর সমাজতন্ত্রে সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী হয় পার্টি। জনগণ হয় পার্টির সদস্য। বুঝা গেল, উভয় তন্ত্রেরই মূল বক্তব্য-জনগণ সর্বময় ক্ষমতার উৎস। অথচ ইসলাম সর্বময় ক্ষমতার উৎস বলে স্বীকার করে একমাত্র আল্লাহ তা'আলাকে। মোদ্দাকথা, ইসলামের বুনিয়াদ খোদায়ী শক্তির উপর। আর গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের বুনিয়াদ জনগণ তথা বস্তুর উপর। মূলভিত্তি হতেই শুরু হয় ইসলামের সাথে গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের সংঘাত। সুতরাং, গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র ইসলাম বিরোধী মতবাদ। তাই এতদুভয়ের কোনটাই ইসলামের শিক্ষাকে বাস্তবায়িত করতে পারে না।

নেতা নির্বাচনের বেলায় ইসলামের শিক্ষা হল সমাজের আলেম জ্ঞানী ও যোগ্যতাসম্পন্ন দ্বীনদার ব্যক্তিগণের পরামর্শের দ্বারা রাষ্ট্রপ্রধান হতে নিম্নস্তর পর্যন্ত যোগ্যতার ব্যক্তি শাসনকার্যে নিযুক্ত হবেন। নেতা বা শাসক নির্বাচনের ব্যাপারে অশিক্ষিত, মূর্খ ও নির্বোধ লোকদের রায় বা পরামর্শের কোন মূল্য নেই। জ্ঞানী-গুণীদের দ্বারা শাসক নির্বাচিত হবার পর দেশবাসী সকলেই তাদের আনুগত্য স্বীকার করে নিবে। যেমন, আল্লাহ তা'আলা বলেন, "হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহ ও রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মান্য কর। আর যে আমীর আল্লাহ ও রাসূলের নির্দেশ মত হুকুম করে, তার অনুগত হও"। [সূত্র: সূরা নিসা, আয়াত ৫৯।।

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "তোমরা আমীরের কথা মেনে চল, যদিও কোন হাবশী নাককাটা গোলামকে (তার যোগ্যতার কারণে) তোমাদের আমীর নির্বাচিত করা হয়"।। সূত্র: তিরমিযী শরীফ। খণ্ড-২, পৃষ্ঠা ৩০০।

কুরআনের আলোকে গণতন্ত্রের অসারতা

পবিত্র কুরআনের দৃষ্টিতে, প্রচলিত গণতন্ত্র অসার ও ভিত্তিহীন। দ্বীন ও রাষ্ট্রের সকল ক্ষেত্রে বর্তমান গণতন্ত্রের বা নিছক সংখ্যাগরিষ্ঠতার বাতুলতা ও ভিত্তিহীনতা সম্পর্কে কুরআনে কারীমের বহু স্থানে স্পষ্ট ভাষায় উল্লেখ করা হয়েছে:

১. "আপনি যতই চান, অধিকাংশ লোক বিশ্বাসী নয়"।। সূত্র: সূরা ইউসুফ, আয়াত-১০৩।
২. "কিন্তু অধিকাংশ লোক বিশ্বাস স্থাপন করে না"।। সূত্র: সূরা মু'মিন, আয়াত-৫৯।
৩. "তাদের অধিকাংশেরই বিবেক-বুদ্ধি নেই"।। সূত্র: সূরা মায়িদা।
৪. "কিন্তু অধিকাংশ মানুষই জ্ঞান রাখে না"। (সূত্র: সূরা ইউসুফ, আয়াত-৫৮।
৫. "কিন্তু তাদের অধিকাংশই মূর্খ"।। সূত্র: সূরা আন'আম, আয়াত-১১১।
৬. "কিন্তু তোমাদের অধিকাংশই সত্য দ্বীনে নিঃস্পৃহ"।। সূত্র: সূরা যুখরুফ, আয়াত-৭৮।
৭. "তোমাদের অধিকাংশই নাফরমান"।। সূত্র: সূরা মায়িদা, আয়াত-৫৯)
৮. "তাদের অধিকাংশই শুধু আন্দাজ ও অনুমানের উপর চলে। অথচ আন্দাজ-
অনুমান সত্যের বেলায় কোন কাজেই আসে না"।। সূত্র: সূরা ইউনুস, আয়াত-৩৬)
৯. "নিশ্চয় বহুলোক আমার মহাশক্তির ব্যাপারে উদাসীন"। (সূত্র: সূরা ইউনুস আয়াত-৩৬।
১০. "তাদের অধিকাংশ লোককেই আমি প্রতিজ্ঞা বাস্তবায়নকারী পাইনি; বরং তাদের অধিকাংশকেই পেয়েছি হুকুম অমান্যকারী"।। সূত্র: সূরা আরাফ, আয়াত-১০।
১১. "তাদের পূর্বেও অধিকাংশ লোক বিপথগামী হয়েছিল"।। সূত্র: সূরা সাফফাত, আয়াত-৭১।

১২. "তাদের অধিকাংশের জন্য শাস্তি অবধারিত হয়েছে। সুতরাং, তারা বিশ্বাস করবে না"।। সূত্র: সূরা ইয়াসীন, আয়াত-৭।

১৩. "অনেকের উপর অবধারিত হয়েছে শাস্তি"।। সূত্র: সূরা হজ্জ, আয়াত-১৮।

১৪. "আল্লাহ তা'আলার হুকুমে বহুবার সামান্য দল বিরাট দলের মুকাবিলায় জয়ী হয়েছে"।। সূত্র: সূরা বাকারাহ, আয়াত-২৪৯)

১৫. "হুনাইনের দিনে তিনি তোমাদের সাহায্য করেছেন-যখন তোমাদের আধিক্য তোমাদের প্রফুল্ল করেছিল, কিন্তু আল্লাহর ফায়সালার মুকাবিলায় তা কোন কাজে আসেনি এবং পৃথিবী প্রশস্ত হওয়া সত্ত্বেও তোমাদের জন্য তা সংকুচিত হয়েছিল। অতঃপর পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে তোমরা পলায়ন করেছিলে"।

১৬. "আপনি বলে দিন, অপবিত্র ও পবিত্র সমান নয়; যদিও অপবিত্রের প্রাচুর্য তোমাকে বিস্মিত করে"।। সূত্র: সূরা আল মায়িদা, আয়াত-১০০।

১৭. "যদি আপনি পৃথিবীর অধিকাংশের কথা মেনে নেন, তবে তারা আপনাকে আল্লাহর পথ হতে বিপথগামী করে দিবে। তারা শুধু অলীক কল্পনার অনুসরণ করে এবং সম্পূর্ণ অনুমানভিত্তিক কথা বলে থাকে।। সূত্র: সূরা আন'আম, আয়াত-১১৬।

উল্লেখিত আয়াতসমূহ দ্বারা স্পষ্টই প্রমাণিত হচ্ছে যে, অধিকাংশরই শিক্ষা নেই, জ্ঞান নেই, অধিকাংশ লোকই সত্য সন্ধানী নয়; সতর্কতা ও বিবেক বুদ্ধির অধিকারী নয়; প্রতিজ্ঞা বাস্তবায়নকারী নয়; তারা জান্নাতী হওয়া এবং আখিরাতের শাস্তি বা আজাবের তোয়াক্কা করে না। পবিত্র কুরআন আরো ঘোষণা করছে যে, সংখ্যাধিক্য তথা গণতন্ত্র সত্যের মাপকাঠি হওয়া তো দূরে কথা, এর মূল ও কেন্দ্র বিন্দুতেই রয়েছে গলদ ও ভ্রান্তি। কেননা, দুনিয়ার অধিকাংশ লোকই জাহান্নামের পথে গমনকারী, গুমরাহ, প্রতিশ্রুতি ভঙ্গকারী, উদাসীন, আন্দাজপূজারী, সত্যনিস্পৃহ, নির্বুদ্ধিতা সম্পন্ন, অজ্ঞতা ও মূর্খতার শিকার। সুতরাং, এ জন্য তাদের রায়ের দ্বারা কোন সঠিক বা সত্য প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। কেবল সংখ্যাধিক্য ইসলামী মূলনীতিতে প্রভাব ফেলতে পারে না। তাই একে কোন সমস্যার সমাধান প্রদানের মাপকাঠি মানা যায় না।

অবশ্য হক্কানী উলামা ও দ্বীনদার বুদ্ধিজীবীগণের অধিকাংশের রায়কে ইসলাম স্বীকৃতি দিয়েছে এবং তার ভিত্তিতে ফায়সালা প্রদানের অনুমতি দিয়েছে। ইসলামের সোনালী যুগে সকল গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত এর ভিত্তিতেই নেয়া হতো।গণতন্ত্রের কুফরী দিকসমূহ

মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন-

وإن تطع أكثر من فِي الأَرْض يُضِلُّوك َعَن سَبِيل ِاللَّهِ ِإِن ْيَتَّبِعُون َإِلَّا الظَّن ًوَإِن ْهُم ْإِلَّا يخرصون

"আপনি যদি পৃথিবীর অধিকাংশের কথা মেনে চলেন, তাহলে তারা আপনাকে আল্লাহর পথ থেকে বিপথগামী করে দিবে। তারা শুধু অলীক-কল্পনার অনুসরণ করে সম্পূর্ণ অনুমানভিত্তিক বলে থাকে" (সূত্র: সূরা আন'আম, আয়াত-১১৬।

কুরআন কারীমে এমন অনেক গুলো আয়াত রয়েছে, যে সব দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ইসলাম প্রচলিত পশ্চিমা গণতন্ত্র সমর্থন করে না। এর সামান্য পূর্বেও উল্লেখ করা হয়েছে পাশ্চাত্য গণতন্ত্র ও ইসলাম সম্পূর্ণ একে অপরের বিপরীত । গণতন্ত্র স্বীকার করলে, কুরআনকে পূর্ণভাবে মানা সম্ভব নয়। আর কুরআনকে পূর্ণভাবে মানলে প্রচলিত গণতন্ত্র স্বীকার করার কোন অবকাশ নেই। কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেছেন যে, তিনি যে মানব জাতিকে সৃষ্টি করেছেন, তার মধ্যে সর্বযুগে জ্ঞানী, গুণী, বিদ্বান ও বিচক্ষণ লোকের সংখ্যা কম রেখেছেন। নির্বোধ, অবুঝ ও কম বুদ্ধির লোক বেশী রেখেছেন। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন যে, "অধিকাংশ মানুষই মূর্খ"।। সূত্র: সূরা আন'আম, আয়াত-১১২।

অথচ প্রচলিত গণতন্ত্রে জ্ঞানী-গুণীর বুদ্ধি পরামর্শের আলাদা কোন মূল্যায়ন করা হয় না। একজন বিবেকহীন মানুষের মতামতের যে মূল্য, একজন জগদ্বিখ্যাত জ্ঞানী ব্যক্তির অভিমতেরও সেই মূল্য। যারা বড় বড় পোস্ট ও পদের ব্যাপারে কোন খবরই রাখে না, তাদেরকে সেই ব্যাপারে রায় দিতে বলা হয়। অথচ তাদের মাঝে যোগ্যতম ব্যক্তিকে নির্বাচিত করার মত বিবেক-বিবেচনা বিদ্যমান নেই। সুতরাং, তারা কখনো ভাল ও যোগ্যতম লোক নির্বাচন করতে পারে না। ফলে তাদের রায়ের ভিত্তিতে অযোগ্য লোকই ক্ষমতায় যাওয়ার বেশী সম্ভাবনা এবং এতে কোন প্রতিষ্ঠান বা দেশ যে সুন্দরভাবে চলতে পারে না, এ কথা দলীল-প্রমাণের মাধ্যমে বুঝাতে চেষ্টা করাও বোকামী।

গণতন্ত্রের ফর্মুলায় বলা হয়েছে যে, "জনগণেরই দ্বারা জনগণেরই জন্য নির্বাচিত।" এ কথাটির মারাত্মক পরিণতি এই যে, গণতন্ত্রের এ ফর্মুলা দ্বারা গণতন্ত্রীগণ বলে থাকেন, জনগণ ক্ষমতার উৎস। অথচ কুরআনে কারীমে বলা হয়েছে, "সকল ক্ষমতার উৎস একমাত্র আল্লাহ তা'আলা।" (সূত্র: সূরা বাকারা, ১৬৫। সুতরাং, কোন মু'মিন কুরআনের বিরুদ্ধে কোন মতবাদ গ্রহণ করতে পারে না।

তাছাড়া এ পদ্ধতির মাধ্যমে যাদেরকে ক্ষমতায় বসানো হয়, তাদের এমন একচ্ছত্র ক্ষমতার মালিক বানানো হয় যে, তারা যে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে। এমনকি আল্লাহ তা'আলার কুরআনী বিধানের বিরুদ্ধেও আইন পাশ করতে পারে। তারা যেন সকল প্রকার শরয়ী জওয়াবদিহিতারও ঊর্ধ্বে। যেমন, শরী'আতে চোরকে হাত কাটার নির্দেশ দেয়া হয়েছে,

মদখোরকে জনসমক্ষে ৮০ ঘা বেত লাগানোর হুকুম দেয়া হয়েছে, অবিবাহিত যিনাকারীকে ১০০ ঘা বেত্রাঘাত এবং বিবাহিত যিনাকারীকে পাথর মেরে হত্যা করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। কিন্তু বিভিন্ন মুসলিম দেশের পার্লামেন্টের সদস্যরা এর কোনটাই বাস্তবায়ন না করে মনগড়াভাবে এর বিরুদ্ধে আইন পাশ করছে। উপরন্তু তারা কুরআনের বিধানকে সেকেলে ও বর্বর বলে আখ্যায়িত করছে। অথচ কুরআনে কারীমের নির্দেশ অনুযায়ী, আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো বিধান দেয়ার অধিকার নেই।। সূত্র: সূরা ইউসুফঃ ৪০। তাই কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে বিধান দেয়ার ব্যাপারে ক্ষমতা প্রদান করলে, তাকে বিধানদাতা আল্লাহর সাথে শরীক করা হয়। যেমন: হাদীসে এসেছে, ইয়াহুদী, খৃষ্টানদের ব্যাপারে আয়াত নাযিল হয় যে, "তারা তাদের পাদ্রীদেরকে ইলাহ বা মা'বুদ বানিয়ে নিয়েছে।" (সূত্র: সূরা তাওবা,৩১)

পূজায় শুভেচ্ছা জানানো নিয়ে যত কথা

১. পূজা কী? — মূল মৌলিক সমস্যা কোথায়?

হিন্দু ধর্মের পূজা হলো—
দেব–দেবীর উদ্দেশ্যে প্রার্থনা
তাদের উদ্দেশ্যে ধূপ, ফুল, প্রসাদ নিবেদন
তাদের কাছে সংকটমোচন চাওয়া
ইসলামের দৃষ্টিতে এসব হলো শিরকভিত্তিক ইবাদত।
এজন্য পূজা একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠান, শুধুই সামাজিক উৎসব নয়।
তাই পূজায় শুভেচ্ছা দেওয়া মানে—
সেই শিরকভিত্তিক ধর্মীয় আচারকে পরোক্ষ স্বীকৃতি দেওয়া,
যা ইসলামে হারাম।

২. মূল নীতি: শিরকভিত্তিক ধর্মীয় অনুষ্ঠানে সমর্থন দেওয়া হারাম

📖 কুরআনের দলীল

(১) মুশরিকদের ধর্মীয় অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ বা সমর্থন নিষিদ্ধ

﴿وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّور﴾

"মুমিনরা 'বাতিল/মিথ্যা' অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয় না।"
— সূরা ফুরকান: ৭২

তাফসিরে ইবনু আব্বাস (রা.), মুজাহিদ, কাতাদা (রহ.) বলেছেন—

“زور বলতে মুশরিকদের উৎসব ও ধর্মীয় অনুষ্ঠান।”*
(২) কুফরি-শিরকের কাজে ঝোঁকা বা সমর্থন করা হারাম

﴿وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا﴾
“জালিমদের দিকে ঝুঁকো না।”
— হুদ: ১১৩
তাফসির:
➡ “ঝুঁকা” মানে—সমর্থন, স্বীকৃতি বা অংশ নেওয়া।

(৩) অন্য ধর্মের রীতিনীতি অনুসরণ করা কঠিন নিষেধ

﴿وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ﴾
“ইসলাম ছাড়া অন্য ধর্ম অনুসরণ হলে তা গ্রহণ করা হবে না।”
— আলে ইমরান: ৮৫

📚 হাদিসের দলীল
(১) নবী ﷺ বলেছেন
"যে কোনো জাতির আচরণ অনুসরণ করে, সে তাদেরই একজন।”
— আবু দাউদ
এটি ধর্মীয় রীতি-নীতি ও উৎসব সমর্থন করাকেও অন্তর্ভুক্ত করে।

(২) নবী ﷺ বলেছেন
“মুশরিকদের উৎসব থেকে দূরে থাকো।”
— ইমাম বায়হাকী বর্ণিত (সনদ হাসান)

৩. বড় আলেমদের (সালাফ, মুফাসসির, ফকিহ) সর্বসম্মত ফতোয়া

ইবনু তাইমিয়্যা (রহ.)
মুশরিকদের ধর্মীয় অনুষ্ঠানে শুভেচ্ছা জানানো
🛑 হারাম

- 🛑 মহান পাপ
- 🛑 কখনো জায়েজ নয়

তিনি বলেন—“তাদের উৎসবের শুভেচ্ছা দেওয়া কুফরির সর্বোচ্চ রূপ।”

— (Iqtida al-Sirat al-Mustaqeem)

ইবনু কাইয়্যিম (রহ.)

তিনি লিখেছেন—“শিরক-ভিত্তিক উৎসবে শুভেচ্ছা জানানো মুসলমানের জন্য হারাম। কারণ এতে তাদের বাতিল ধর্মকে স্বীকৃতি দেওয়ার বুঝায়।”

— (Ahkam Ahl al-Dhimma)

আল-মারঘিনানি (হানাফি ফকিহ)

হিন্দু/মুশরিকদের ধর্মীয় উৎসবে অংশগ্রহণ, শুভেচ্ছা জানানো জায়েজ নয়।

মালিকি–শাফেয়ি–হানাবলি মাযহাব

ধর্মীয় উৎসবে শুভেচ্ছা দেওয়া নিষিদ্ধ।

৪. পূজার শুভেচ্ছা দেওয়া কেন হারাম? — মূল কারণগুলো

(১) এতে শিরকভিত্তিক ধর্মকে সম্মান/স্বীকৃতি দেওয়া হয়

“শুভ দুর্গাপূজা” বললে এর অর্থ দাঁড়ায়—

“আপনার শিরকভিত্তিক ইবাদত শুভ হোক।”

এটি ইসলামী আকীদার বিরোধী।

(২) ধর্মীয় সীমা অতিক্রম হয়

ইসলাম মুসলমানকে অন্য ধর্মের সাথে ধর্মীয় মিল রাখাকে নিষিদ্ধ করেছে।

(৩) মুসলমানদের আকীদা দুর্বল হয়

এতে “সব ধর্মই ঠিক”—এমন ভুল ধারণা তৈরি হয়।

(৪) কোরআনে মুশরিকদের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ বারণ করা হয়েছে

৫. তবে অমুসলিমদের সাথে সৌজন্যমূলক আচরণ – ইসলাম অনুমোদন করে

ইসলাম নিষেধ করেনি—

- ✔ ভালো আচরণ
- ✔ মানবিক ব্যবহার
- ✔ প্রতিবেশী–বন্ধুর সাথে শিষ্টাচার
- ✔ সহযোগিতা, উপকার করা

কিন্তু শর্ত হলো—
ধর্মীয় অনুষ্ঠান সমর্থন করা যাবে না।

৬. তাহলে কী বলা যাবে? — আপনি যা বলতে পারবেন (জায়েজ)

অমুসলিম বন্ধুকে কখনো কষ্ট দিতে হবে না।
আপনি বলতে পারেন—

- ✔ "আপনার জন্য শান্তি ও কল্যাণের কামনা করি।"
- ✔ "আপনার সুস্থতা ও মঙ্গল হোক।"
- ✔ "আপনার দিনটা ভালো কাটুক।"
- ✔ "আপনার পরিবার ভালো থাকুক।"

এসব কথা

- ☑ মানবিক
- ☑ সৌজন্যমূলক
- ☑ ধর্মীয় সমর্থন নয়

তাই জায়েজ।

৭. যা বলা যাবে না (নিষিদ্ধ)

"শুভ দুর্গাপূজা"
"শুভ সরস্বতী পূজা"
"হ্যাপি পূজা"
"দেবীর আশীর্বাদ কামনা করি"

কারণ এগুলো সরাসরি ধর্মীয় সমর্থন বহন করে।

শেষ কথা

ইসলাম ধর্মীয় সীমা রক্ষা করে চলতে বলে।
তবে অমুসলিমদের সাথে ভালো আচরণ, দয়া, মানবিকতা বজায় রাখতে বলে।
ধর্মীয় সমর্থন নয়—মানবিক শুভেচ্ছা প্রয়োজন।

ঈমান রক্ষায় করনীয়

নিচে ঈমান ঠিক রাখা ও দৃঢ় করার জন্য একজন মুসলিমের করণীয়গুলো কুরআন–সুন্নাহ ও আলেমদের নির্দেশনা অনুযায়ী খুবই সহজ, গভীর ও বাস্তবধর্মীভাবে তুলে ধরা হলো।

এগুলো মেনে চললে ঈমান শক্ত, স্থায়ী ও পবিত্র থাকে।

⭐ ১. আকীদা ঠিক করা (তাওহীদ শুদ্ধ করা)

ইসলামে ঈমান ঠিক রাখার সবচেয়ে বড় কাজ—
আল্লাহকে একত্ববাদের সাথে মানা, শিরকের সব পথ বন্ধ করা
কী করতে হবে?
আল্লাহ ছাড়া কাউকে ভরসা না করা
কবর, পূজা, তাবিজ, গণক—এসব থেকে দূরে থাকা
প্রত্যেক ইবাদত শুধুই আল্লাহর জন্য করা
📖 আল্লাহ বলেন:
"আল্লাহর সাথে শিরক করো না।" — সূরা নাহল: ৩৬

⭐ ২. ফরজ ইবাদতগুলো ঠিকভাবে পালন করা

ঈমান ঠিক করার সবচেয়ে বাস্তব উপায়—
✔ পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ
নবী ﷺ বলেছেন:
"নামাজ ঈমানের স্তম্ভ।" — সহিহ মুসলিম
✔ রোজা, জাকাত, হজ (সামর্থ্য হলে)
ফরজ বিষয়গুলো পালন করলে ঈমান জীবিত ও শক্ত থাকে।

⭐ ৩. কুরআন তিলাওয়াত ও বোঝা

নিয়মিত কুরআন পড়া—
মনকে পরিশুদ্ধ করে
ঈমান বৃদ্ধি করে
আল্লাহর পথ দেখায়
📖 "মুমিনদের ঈমান বৃদ্ধি পায় যখন তারা কুরআন শুনে।" — সূরা আনফাল: ২

⭐ ৪. নিজের গুনাহের জন্য তওবা করা

তওবা ঈমানকে ধুয়ে পরিষ্কার করে।
অভিধান: গুনাহ বুঝতে পারা ,অনুতপ্ত হওয়া, পুনরায় না করার সংকল্প

নবী ﷺ প্রতিদিন ১০০ বার তওবা করতেন।

⭐ ৫. সুন্নাহ অনুযায়ী জীবন গড়া

রাসুল ﷺ-এর আদর্শ মানা মানে—

ঈমানকে সঠিক পথে পরিচালনা করা।

কুরআনে আল্লাহ বলেন:

“তোমরা রাসূলকে মানো, তাহলেই হিদায়াত পাওয়া যাবে।” — সূরা নূর: ৫৪

⭐ ৬. ভালো সঙ্গ রাখা, খারাপ সঙ্গ ত্যাগ করা

সঙ্গ ঈমান নষ্ট করার সবচেয়ে বড় মাধ্যম।

ভালো সঙ্গ ঈমান বৃদ্ধি করে

খারাপ সঙ্গ গুনাহ ও দুর্বলতা বাড়ায়

হাদিস:

“মানুষ তার বন্ধুর ধর্মের ওপর থাকে।” — তিরমিযি

⭐ ৭. দোয়া করা – ঈমান দৃঢ় রাখার জন্য

নবী ﷺ প্রায় হায়াত জুড়ে দোয়া করতেন—

✔ “হে হৃদয় পরিবর্তনকারী, আমার হৃদয়কে তাওহীদের ওপর স্থির রাখুন।”

— তিরমিযি

এই দোয়া প্রতিদিন পড়ুন।

⭐ ৮. হালাল-হারাম মেনে জীবনযাপন

হারাম খাবার, হারাম আয়, হারাম কাজ— ঈমানকে নষ্ট করে , দোয়া কবুলে বাধা দেয়

হালাল জীবিকা ঈমানের জন্য শক্ত ভিত।

⭐ ৯. কবর, জাদু, তাবিজ, ভবিষ্যৎ বলা এসব থেকে দূরে থাকা

এসব ঈমান নষ্ট বা দুর্বল করার বড় মাধ্যম।

নবী ﷺ বলেছেন:

“যে গণকের কাছে যায়, তার ৪০ দিনের নামাজ কবুল হয় না।”

— সহিহ মুসলিম

⭐ **১০. জ্ঞান অর্জন করা (ইলম নেওয়া)**

ইলম ছাড়া ঈমান স্থায়ী হয় না।

শেখার বিষয়:

তাওহীদ,কালিমার শর্ত ,ঈমান নষ্টকারী কাজ

ফরজ বিষয়গুলো

হাদিস:

"ইলম অর্জন করা প্রত্যেক মুসলিমের জন্য ফরজ।"

— ইবন মাজাহ

⭐ **১১. নফল ইবাদত বাড়ানো**

যেমন: নফল নামাজ ,তাহাজ্জুদ ,কুরআন মুখস্থ ,জিকির ,দান-সদকা

হাদিস:

"বান্দা নফল ইবাদতের মাধ্যমে আল্লাহর কাছে ঘনিষ্ঠ হয়।"

— বুখারি

⭐ **১২. পাপ থেকে বাঁচা – বিশেষ করে চোখ, জিহ্বা, শরীরের পাপ**

পর্দা লঙ্ঘন ,অপবাদ ,অশ্লীলতা

এসব ঈমানকে ভিতর থেকে নষ্ট করে দেয়।

১৩. আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল করা

যে আল্লাহর ওপর নির্ভর করে তার ঈমান দৃঢ় হয়।

সারসংক্ষেপ: ঈমান ঠিক রাখার ৭টি মূল পয়েন্ট

1. তাওহীদ শুদ্ধ করা
2. ফরজ আমল ঠিক রাখা
3. কুরআন–হাদিসের জ্ঞান নেওয়া
4. তওবা ও জিকির বাড়ানো
5. সুন্নাহ জীবন গড়া
6. খারাপ সঙ্গ ত্যাগ করা
7. হারাম থেকে দূরে থাকা